সমরেশ বসু

মৌসুমী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

boiRboi.net

বিকালে ভোরের ফুল

boirboi.net

ভাদ্র—১৩৭৯
সেপ্টেম্বর—১৯৭২
তৃতীয় মুদ্রণ :
১লা বৈশাখ—১৩৮১
এপ্রিল—১৯৭৪

প্রচ্ছদশিল্পী : গৌতম রায়

প্রকাশক :
দেবকুমার বসু
মৌসুমী প্রকাশনী
১এ, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীদুলালচন্দ্র ঘোষ
নিউ লোকনাথ প্রেস
৮এ, কাশী বোস লেন
কলকাতা-৬

দাম : দশ টাকা

boiRboi.net

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের ঃ

গঙ্গা

রূপকথা

ছুটির ফাঁদে

ছেঁড়া তমসুক

রামনাম কেবলম

ভানুমতীর নবরঙ্গ

তিন ভুবনের পারে

সময়টাকে এখনো পূজাবকাশ বলা যায়। দিন তিনেক আগে কালীপূজা হয়ে গিয়েছে। আকাশে এখনো শরতকালের ছেঁড়া মেঘের টুকরো থাকলেও, সন্ধের দিকে একটু যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। ঠাণ্ডা ভাব থাকলেও, একটু হাঁটাহাঁটি করলে, কিছুক্ষণ বন্ধ ঘরে থাকলে, গরমও লাগে। বোধহয় এ সময়টাকেই দো-আঁসলা বলে। একটু সাবধানে না থাকলে, ঠাণ্ডা গরমে সর্দি কাশি লেগে জ্বর হবার সম্ভাবনা। আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলেছিল, বাঙলা দেশের প্রত্যেক ঋতুর শুরুতেই আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়, অথচ সাধারণ মানুষ সব সময়ে খেয়াল রেখে চলতে পারে না, সেই হেতু অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে ডাক্তার বন্ধুটির কথা যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। ব্যাধির হিসাবটা ওরাই ভাল বলতে পারে। এবং এটাও ঠিক, বাঙলা দেশে ছয় ঋতুর পরিবর্তন যত স্পষ্ট, এমন বোধহয় আর কোথাও দেখা যায় না।

কিন্তু সে যা-ই হোক, ঋতুর বিশ্লেষণে এখন আমার মন নেই। সমুদ্রের ধারে, এখন এই হেমন্তের শুরুর আবহাওয়াটা আমার ভারি স্নিগ্ধ আর মিষ্টি লাগছে। আমি আমার ঘর থেকেই সমুদ্র দেখতে পাচ্ছি। এ বাড়িটি একটু নির্জনে, ঘিরে আছে বড় বড় ঝাউ গাছের ছায়ায়। অনেক পরিশ্রম করে, বালির আক্রমণকে প্রতিহত করে, এই দোতলা বাড়ির প্রশস্ত চৌহদ্দিতে কিছু সুপারি নারকেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে। আম জামও কিছু আছে। এমন কি সবুজ ঘাস, ফুলের বাগানও আছে। ফুল গাছগুলো অধিকাংশই বিরাট টবে লাগানো। বেল জুঁই ছাড়া গোলাপও আছে। দেখলেই বোঝা যায় সব কিছুতেই পরিশ্রমী সযত্ন হাতের স্পর্শ রয়েছে। তা না হলে, সমুদ্র থেকে কিছুটা দূরে একখণ্ড উঁচু জমির ওপরে দোতলা বাড়িটি

এমন গাছপালার ফুলে আর রঙে এমন ঝকঝকে তকতকে থাকত না।

বাড়িটি আমার এক ব্যারিস্টার আত্মীয়ের। কলকাতা থেকে এমন কিছু দূরে না, বাঙলা দেশের বাইরেও না, দীঘা তো এখন সকলের মুখে মুখে। উইক এণ্ড-এর অবকাশ কাটানোর সব থেকে সুন্দর জায়গা। উইক এণ্ড-এ ভিড়ও যথেষ্ট হয়। আমার আইন-জীবী আত্মীয়টি অবিশ্যি বিশেষ আসা-যাওয়া করেন না। কিন্তু যত্নের কোন ত্রুটি রাখেননি। তিনজন লোক সারা বছর ধরে এ বাড়ি বাগান রক্ষা করে।

এ বাড়িতে এসে বাস করার ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি নেই—ছ'টি বড় বড় শোবার ঘর। সব ঘরেই ডাবল বেডেড খাট বিছানা ড্রেসিংটেবিল ওয়ারড্রোব আলমারি এবং অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম। বাথরুমগুলো পুরোপুরি আধুনিক। জলের কোন অভাব নেই, নিজস্ব টিউবওয়েল এবং পাম্প আছে, ইলেকট্রিক আছে। নিচের তলায় এবং ওপর তলায় হলঘরের মত বড় সাজানো ড্রইংরুম রয়েছে। পাঁচিল ঘেরা চৌহদ্দির এক দিকে ব্যাডমিণ্টন কোর্ট আছে। বৃটিশ আমলের আরো কয়েকজন ব্যারিস্টার সিভিলিয়ান আই. সি. এস-দের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই তৈরি করিয়েছিলেন। তৈরি অনেকেই করান, কিন্তু দীর্ঘকাল তা সযত্নে রক্ষা করেন কম লোকই। বিশেষত এ বাড়ি যখন তৈরি হয়েছে তখন আজকের এই দীঘা সেই দীঘা ছিল না।

রান্নাঘর, চাকর বেয়ারাদের থাকবার ব্যবস্থা আলাদা। রান্না করবার জন্য পাচক আছে। রান্নার সবরকম ব্যবস্থা আছে। এমন কি রেফ্রিজারেটরও আছে। আত্মীয়ের বাড়ি হলেও, আমি বাড়িটিকে ভালবেসে ফেলেছি। ভালবাসার মতই বাড়ি এবং ব্যবস্থা। সময়ের কোন ঠিক না থাকলেও, বছরে একবার আমি আসি। একলাই আসি এবং গাড়ি নিয়ে আসি।

আমার সঙ্গে আর কে-ই বা আসতে পারে। আমার থেকে কয়েক বছরের ছোট ভাই আর ওর স্ত্রী দীঘায় আসতে চায় না। কয়েকবার এসে এসে নাকি ওদের কাছে দীঘা পচে গিয়েছে।

আমার কাছে তা অবিশ্যি হয়নি। তা নইলে, প্রতি বছরই অন্তত একবার আসা কেন। আমাদের সংসারে আর আছেন আমার বাবা। তিনি অশক্ত বা অথর্ব নন, এখনো যথেষ্ট কর্মঠ। আমাদের একটি ফরেন ইম্পোর্ট বিজনেস আছে। সম্প্রতি একটি এক্সপোর্ট বিজনেসের লাইসেন্সও পাওয়া গিয়েছে। বাবা আর আমার ছোট ভাইয়ের ওপরেই ব্যবসার দায়িত্ব। বাবা এখনো বেশ ভাল ভাবেই কাজ করে চলেছেন।

বাবার ইচ্ছানুযায়ী বিলাত থেকে এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছি। সে সময়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল একটি এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরি করবেন। আমাকে তার দায়িত্ব দেবেন। নানা কারণে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তা না হলেও, যাকে বলা যায় কেরিয়ার, সেদিক থেকে আমার কোন ক্ষতি হয়নি। বাঙলাদেশের বিশেষ নামকরা একটি বৃহৎ এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরি. প্রথম শ্রেণীর এঞ্জিনিয়ারিং পদে আছি। হাজার আড়াই টাকা বেতন ছাড়াও কোয়ার্টার ড্রাইভারের বেতন, পেট্রল খরচ পাই। তা ছাড়াও বিবিধ সুযোগ-সুবিধা আছে। যদিও আমি কোয়ার্টারে থাকি না, আমাদের পার্কসার্কাসের বাড়ি থেকে যাতায়াত করি।

আমার বাবা অবিশ্যি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করেন, ঠোঁট উল্টে বলেন, তবু এটা হল চাকরি। আর বেতন এবং সুযোগ-সুবিধাই বা এমন কী। নিজেরা কারখানা করতে পারলে. ওরকম এঞ্জিনিয়ার আমরাই রাখতে পারতাম।

আমাদের বিদেশী আমদানি রফতানি ব্যবসায়টাও মূলত বিবিধ যন্ত্রপাতির। সেজন্য বাবা মাঝে মাঝে একথাও বলেন, আমাদেরও তো একজন পাকা এঞ্জিনিয়ার দরকার। তোমার বেতন আর সুযোগ-সুবিধা সবই বাড়িয়ে দিচ্ছি, তুমি আমাদের বিজনেসে জয়েন কর।

দরকার আছে ঠিকই। কিন্তু আমার সে রকম কোন ইচ্ছা হয় না। আমার চাকরিটা মোটেই ফাঁকির চাকরি না, যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ। বাবার কথায় সম্মত না হওয়ার আর কোন কারণ নেই, যেহেতু আমি

একটা বিশেষ কাজ এবং নিয়মের মধ্যে জড়িয়ে আছি, সেখান থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই না। আমাদের পারিবারিক ব্যবসা ঠিকই চলে যাবে। আমার ছোট ভাই যথেষ্ট বিচক্ষণ এবং দায়িত্বশীল। ব্যবসার কাজটা ভালই বোঝে। অফিস বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে চালায়। তবু আমার বাবার কথার মধ্যে একটি সত্য তো আছেই। তিনি আমাকে আরো বেশি বেতন দিতে পারেন। অবিশ্যি বেতনের কোন প্রশ্নই নেই। পারিবারিক সম্পত্তিটা আমারও। এই হিসাবে আমাদের অবস্থাপন্নই বলতে হবে। তিনটি গাড়ি, একাধিক বাড়ি আছে। জীবিকার দিক থেকে আমি এঞ্জিনিয়ার বটে, কিন্তু আমার অন্য একটা পরিচয়ও আছে। সেই পরিচয়েই আমাকে সবাই চেনে এবং জীবিকা ছাড়া মননের যদি অন্য কোন ক্ষেত্র থাকে, তাহলে সেখানেই বোধ হয় আমি মরি এবং বাঁচি।

কিন্তু সে কথা এখানে নয়। যে কথা ভাবছিলাম তাই বলি। বাবা তাঁর নিজের মতই বেড়াতে পছন্দ করেন। আমিও যে তাঁর সঙ্গে কোথাও যাব, সেটা ভাবতে পারি না। বেড়াতে বেরিয়ে পড়াটা, আমার নিজের মতই। আমার এক দিদি আছেন, একটি ছোট বোন। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আমাদের মা নেই, বছর দশেক আগে মারা গিয়েছেন। দরোয়ান চাকর বেয়ারা পাচক ঝি এবং ড্রাইভারদের বাদ দিলে আমাদের পরিবার ছোটই। বাবা আমি ছোট ভাই ওর স্ত্রী।

অতএব আমার সঙ্গে কে-ই বা আসবে। তবু একটা কথা বোধ-হয় থেকেই যায়। এই উত্তর তিরিশ, চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়সেও আমি একলাই বা কেন। আমার সঙ্গেই তো কেউ থাকতে পারত। আমি তো বিপত্নীক নই। অথচ আমার ছোট ভাইয়ের প্রেম সাঙ্গ হয়ে বিয়ে করাও হয়ে গিয়েছে। আর আমি আয়নার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসি। জুলফির কাছে কয়েকটি শাদা ফুলের দিকে তাকিয়ে নিজেই জিজ্ঞেস করি, ব্যাপার কী হে অনীশ, তুমি তো ভীষ্মদেব নও, সে-রকম কোন ঘটনাও নেই, ওদিকে যে ঘণ্টা বেজে গেল। জিজ্ঞেস

করে নিজের মনেই হাসি। সঠিক জবাব খুঁজে পাই না। যাকে বলে ব্যর্থ প্রেমের খোয়ারি সে-রকম কিছু আমার জীবনে ঘটেনি। তবু দেখছি, রঙিন প্রজাপতিটা একদিন গায়ের কাছে একটু ছায়া ফেলেও গেল না। অথচ তার জন্য কোন দুঃখ নেই। আমি যেন নিজের মধ্যেই নিজে এক রকম আত্মহারা। এতগুলো বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেছি, কন্টিনেন্টের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। বলতে গেলে রঙিন প্রজাপতির মতই নেচে বেড়িয়েছি। তার মধ্যে আমার কত বন্ধু প্রজাপতির পাখার ঝাপটায় ঘায়েল হয়ে, সমুদ্রপারের বধূ নিয়ে ঘরে ফিরেছে। আমার বাবা তো ভয়ই পেয়েছিলেন, আমিও সে-রকম কিছু করে বসব কী না। কেননা, আমার বাবা একটু রক্ষণশীল মানুষ। কিন্তু বিদেশিনীর নীল চোখের আমন্ত্রণ দূরের কথা, এ দেশের কালো হরিণ চোখের কটাক্ষেও বিদ্ধ হলাম না। বলতে ইচ্ছা করে, অনীশ, তোমাকে ধিক! এমন কন্দর্পকান্তি বলিষ্ঠ পুরুষ চেহারাটি নিয়ে কী করলে। চেহারার কথাও না হয় বাদ দিলাম, তুমি এঞ্জিনিয়ার বটে, আসলে তো তুমি কবি। (কথাটা শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম) আধুনিক কবিদের মধ্যে, তোমার প্রেমের কবিতাকে বলা হয় অতুলনীয়। যুবক যুবতীরা তোমার কবিতার লাইন আবৃত্তি করে গুঞ্জন তোলে। ভারতীয় সঙ্গীত সম্পর্কে তুমি একজন অভিজ্ঞ। গায়ক নও বটে, তবু সঙ্গীত বিষয়ে তোমার প্রবন্ধ রীতিমত জ্ঞানগর্ভ। এতগুলো ব্যাপার থাকতেও তোমার বিয়ের ফুল ফুটল না?

সত্যি মাঝে মাঝে নিজের অবাক লাগে। বন্ধুরা নানা রকম ঠাট্টা করে। বাবা তো চিন্তিত। মনীশ—আমার ছোট ভাই আর ওর স্ত্রী ললনাও আমার পিছনে লাগে, মাঝে মাঝে জোর করে। কিন্তু যাকে বলে 'আর্জ', আমি নিজের মধ্যে সে-রকম কিছু অনুভব করি না। আমি কী অস্বাভাবিক? আজ পর্যন্ত [illegible] নিজের কাছে সে রকম কিছু ধরা পড়েনি। নিজের শরীর [illegible]কে বুঝতে পারার মত চিন্তা বা বুদ্ধি আমার আছে।

যদিও এ কথা ঠিক, বিশেষ একটা সময় পর্যন্ত আমি এসব কথা

ভাববার সময় পাইনি, প্রেমের চিন্তাও আসেনি, নিজের পড়াশোনা এবং কাজ নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি। আজও আমি ব্যস্তই। আমার চাকরি, লেখা কবিতা সঙ্গীত, সব কিছু নিয়ে আমার জগতে আমি ভরপুর হয়েই আছি। আমার হাসির ঝিলিকে কখনো ছায়া পড়েনি। আমার উজ্জ্বল জীবন যাপন কখনো মলিন হয় নি। এমন কি, একটু আধটু খেলাধূলা ছেলেমানুষি করতেও ভাল লাগে। পিছনে ফিরে বা সামনে তাকিয়ে আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে না। তবু আমার ঠোঁটে একটু হাসি খেলে যায়। ক্রিশ্চিয়ান কলেজে পড়বার সময় শেষ বছরে এক প্রফেসরের মেয়ের সঙ্গে আমার কী যেন একটু হয়েছিল। ওর নাম ছিল সুনীতা। আমার আঠারো, ওর ষোল। হঠাৎ যেন কিছুদিন একটা ঘোর লেগেছিল। সে কি কেবল চোখের দেখার ভাল লাগা, অথবা নিতান্ত একটা বয়সেরই স্বভাব, তা জানি না। সেই স্মৃতির সঙ্গে ঝাপসা ভাবে মিশে আছে বুক ধকধকানো কিছু আবেগ, আলিঙ্গন, চুম্বন। তারপরে ইংল্যাণ্ডে যাবার আগেই বোধ হয় সব ভুলে গিয়েছিলাম। এখন একটা হাস্যকর স্মৃতির মত মনে হয়। সুনীতা এখন দুটি সন্তানের জননী, সুখী ঘরণী। মাঝে মধ্যে দেখা হয়, আমার অবিবাহিত জীবন নিয়ে ঠাট্টাও করে। আমি বলি, তুমিই তো যত নষ্টের মূল। যদিও আমরা দুজনেই জানি, কথাটা নিতান্তই ঠাট্টা।

বিকালের রক্তিম আলো আকাশে, সমুদ্রের নীলে, আকাশের সাদা মেঘের গায়ে রক্তিম ছটা। নারকেল সুপারির চিকচিকে পাতায় ঝাউয়ের পাতার ফাঁকে ফাঁকে রক্তাভা। বেলা শেষ হয়ে আসছে। সমুদ্রের ধারে দেখতে পাচ্ছি বেশ লোকজন ছড়িয়ে পড়েছে। আমারও এখন আর ঘরে থাকতে ইচ্ছা করছে না। একটু আগেই বৈকালিক

চা পান হয়ে গিয়েছে। বাইরে যাবার জন্য শার্ট আর ট্রাউজার আগেই বদলে নিয়েছিলাম।

উঠে বাইরে যাবার আগে টেবিলের ওপর ছড়ানো বইগুলোর ওপর চোখ পড়ল। অধিকাংশই বিদেশী কাব্য, নাটক এবং কাব্য-নাট্যের বই। আমার প্রিয় কবিদের লেখা। অন্যান্য বইও কয়েকটা রয়েছে। প্রায় সম্পত্তি সুখ-দৃষ্টিতে বইগুলোকে দেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

খানিকটা ঘুরে সৈকতাবাস পেরিয়ে সমুদ্রের ধারে যাবার জন্য রাস্তাটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। এমনিতেই ভ্রমণকারীদের ভিড় মোটামুটি আছে। তার ওপর দেখলাম সমুদ্রের ধার থেকে যেন একটি মিছিল এগিয়ে আসছে। এক পাশের লাইনে শুধু মেয়ে, আর এক পাশের লাইনে শুধু ছেলে। সব ছেলেমেয়েরই বয়স প্রায় ষোল থেকে আঠারোর মধ্যে। মিছিলের পশ্চাৎপটে রক্তিম আকাশ এবং সমুদ্র বেশ লাগল।

আমি প্রথমে এক পাশে সরে দাঁড়ালাম। তারপর মিছিলের উজানে, ধার দিয়ে ধার দিয়ে সমুদ্রের ধারের দিকে এগিয়ে চললাম। মিছিলের ব্যাপারটা কী, কিছুই বুঝতে পারছি না। সবাই বেশ হাসি-খুশি, যদিও চলার মধ্যে একটা ডিসিপ্লিন আছে। কোন ফেস্টুন পতাকা নেই। দেখে মনে হচ্ছে স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে হবে।

ছেলে আর মেয়েদের সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে চোখাচোখি হচ্ছে। কিন্তু মেয়েদের দিক থেকেই দু-একটা কথা শুনে আমি যেমন অবাক হলাম, হাসিও পেল মনে মনে। আজকাল অবিশ্যি এতে অবাক হবার কিছুই নেই। একটি মেয়ের গলায় শুনলাম, একজন বিদেশী চিত্রতারকার নাম করে আমার দিকে চেয়ে হাসল, সামনের বান্ধবীর গায়ে একটু খোঁচা দিল। যার গায়ে খোঁচা দিল, সে আমার দিকে তাকাবার আগেই আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। দেখে নিলাম আমার আশপাশে আর কেউ আছে কী না। কেউ নেই। তারপরেও দুটি কথা শুনতে পেলাম, হ্যাণ্ডসাম। চোখ দুটো হাঁদার মত।

হায়রে, যদি আমাকেই বলা হয়ে থাকে, তবে অন্তত আমার চোখ সম্পর্কে কোন কালে এমন কথা শুনতে হয়নি। বেশ, বালিকাগণ, তোমাদের যদি মনে হয় তবে তাই।

মেয়েদের লাইনের একেবারে শেষে, আমাকে অবাক করে দিয়ে একজন বলে উঠলেন, আপনি!

আমাকেও থমকে দাঁড়াতে হল। চেনা মহিলার মুখ। নাম সীতা রায়, আমাদের বাড়ির কাছেই থাকেন। কবিতা পাঠ করতে ভালবাসেন। একটি কলেজের অধ্যাপিকা। বললাম, হ্যাঁ বেড়াতে এসেছি। আপনি কবে এলেন?

গতকাল। ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেমেয়েদের ইন্টার-কলেজ ক্যাম্প হচ্ছে এখানে। আমি মেয়েদের নিয়ে এসেছি।

বললাম, ও, আচ্ছা।

সীতা রায় জিজ্ঞেস করলেন, একলাই এসেছেন?

—হ্যাঁ।

ইতিমধ্যে সীতা রায়ের কাছে আরো কয়েকজন প্রায় ওঁরই বয়সী (প্রায় পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ) কিংবা আরো কিছু অল্পবয়সী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। সীতা রায় সকলের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলেন। সকলেই বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপিকা। নমস্কার বিনিময় হল। ওঁদের দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে মেয়েরাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল। সীতা রায় হাত তুলে গলা একটু চড়িয়ে মেয়েদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা ক্যাম্পে চলে যাও।

মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে চলতে আরম্ভ করল। ছেলেদের লাইনটা খানিকটা গিয়েই বাঁদিকে মোড় নিয়েছিল। ওদের ক্যাম্প আলাদা। মেয়েরা ভিতরের দিকে এগিয়ে চলল।

সীতা রায় আমার দিকে ফিরে বললেন, অনীশবাবু আজ আপনি আমাদের মেয়েদের ক্যাম্পে আসুন। আপনাকে যখন এখানে পাওয়া গেছে তখন আর ছাড়ছি না।

হেসে বললাম, আমি ক্যাম্পে গিয়ে কী করব ?

একজন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী অধ্যাপিকা বলে উঠলেন, কবি অনীশ মিত্রকে ক্যাম্পে পেলে মেয়েরা ভীষণ খুশি হবে।

আর একজন বললেন, আমরাও।

আবার আর একজন বললেন, তাছাড়া আর কেউ যখন আপনাকে চিনতে পারে নি, আমরা কথাটা জানাজানি করতে চাই না। তাহলে অধ্যাপকরা এসে আপনাকে ছেলেদের ক্যাম্পে টেনে নিয়ে যাবেন।

আমি হেসে উঠে বললাম, আমি এমন একজন কেউ নই যে, আমাকে নিয়ে টানাটানি করবে সবাই।

সীতা রায় বললেন, আপনার বিষয়ে আমরাই জানি আপনার থেকে বেশি। মোটের ওপর আজ আপনি আসছেন। মেয়েদের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেব। আপনি একটু ওদের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলবেন।

একজন মহিলার অনুরোধ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। বললাম, বেশ যাওয়া যাবে।

সীতা রায় জিজ্ঞেস করলেন, এখন আপনি কোথায় চললেন ?

—কোথায় আর, সমুদ্রের ধারে একটু বেড়াতে বেরিয়েছি।

সীতা রায় তাঁর সঙ্গিনীদের দিকে একবার তাকালেন। তারপরে বললেন, আজ একটু কম বেড়াবেন। আমাদের ওখানে তাড়াতাড়ি আসুন। আমি গিয়ে এখনই মেয়েদের বলে রাখছি। আর—।

সীতা রায় একটু বিব্রত হেসে বললেন, এভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে আমন্ত্রণ জানালাম বলে কিছু মনে করলেন না তো ?

বললাম, কিছু মনে করলে আর যাবার সম্মতি দেব কেন বলুন ?

সীতা রায় বললেন, তবু আপনার মত একজন ব্যক্তিকে—।

বাধা দিয়ে বললাম, অসাধারণ কিছু ভাববেন না। আপনারা যান, আমি ঘুরে আসছি।

—কিন্তু আপনি তো জায়গাটা চেনেন না।

—এইটুকু ছোট জায়গায় কোন কিছু আবার চিনতে হয় নাকি।

এক পাক ঘুরলেই তো সবাইকে খুঁজে পাওয়া যায়।

সীতা রায় বললেন, তবু বলে রাখি, ফরেস্টের বাঙলোর আগেই বাঁদিকে যে সরকারী নতুন বিল্ডিং হয়েছে, ওখানেই আমাদের ক্যাম্প। এলেই বুঝতে পারবেন।

বললাম, আপনারা নিশ্চিন্তে ফিরে যান।

আমি সমুদ্রের ধারের দিকে নেমে গেলাম। ওঁরা ফিরে গেলেন। মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করছি। কখনো সভা-সমিতিতে যে একেবারেই যাইনি তা নয়। এ ব্যাপারটা সে-রকম সভাও নয়। তবু এসবে আমি অস্বস্তি বোধ করি। বেশি লোকের সামনাসামনি হতে গিয়ে আমি খুব একটা অনায়াস বোধ করি না। বিশেষত একজন কবি বা প্রাবন্ধিক হিসাবে। উনিভার্সিটিতে দু-একবার গিয়েছি। প্রথম বর্ষের কলেজের মেয়েদের সামনে কখনো যাইনি। তাও আবার ওই সব মেয়েদের। কথা কয়টি এখনো আমার কানে লেগে রয়েছে। যদিও এটাকে আমি একটা ছেলেমানুষি হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই ভাবি না। তুলনায়, এই বয়সের বিদেশের ছেলেমেয়েরা আরো কয়েক কাঠি সরেশ। তাদের সকলেরই গার্লফ্রেণ্ড বয়ফ্রেণ্ড আছে, সপ্তাহে ডেটিং আছে। শুনেছি মেয়েরা বিশেষ সাবধানী, মেয়েদের মাসান্তে একটি করে জন্মনিয়ন্ত্রণের বটিকা সেবন করিয়ে দেন।

চমৎকার! আমাদের দেশ কতটা অগ্রসর হয়েছে সঠিক জানি না। তবে আমাদের সময়ের তুলনায় ওরা আজকাল অনেক বেশি সহজ অনায়াস এবং স্বচ্ছন্দ। ভিতরটা কতখানি শক্ত আছে জানি না। তবে সমাজের এবং পরিবারের মূল্যবোধ যে বদলায়, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

আমি পুবদিকের তীর ধরে হেঁটে চললাম। এই দিকটাই আমার বেশি ভাল লাগে। এমনিতেই দীঘার বালুচর যথেষ্ট শক্ত, মাটির পরিমাণ অনেকখানি। টু-সীটার এরোপ্লেনও নামে। গাড়ি তো চলেই, এমন কি হেভি ট্রাকও চলে। তবে এদিকটা শুকনো। পশ্চিমে একটু কাদা ভাব। নয়ানজুলিও বেশি।

বাঁদিকে ঘন ঝাউবন। অনেক কষ্টের বন। এ বন কষ্ট করে তৈরি করতে হয়েছে ভূমিগ্রাসী লবণাক্ত বালির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য। বাতাসের গায়ে অষ্টপ্রহর এই সমুদ্রের বালি উড়ছে, ভূমিগ্রাস করছে। নোনা বালি জমিতে কোন ফসলই ফলানো যায় না। দেশ জনপদকে সে লবণাক্ত মরুভূমি করে তুলবে, যদি নিরন্তর তার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া না হয়। এ ঝাউবন তাই দেখতে যেমন নয়ন ভুলানো, তেমনি জীবনদাত্রী। উঁচু বালির ঢিবিতে আরো এক রকমের লতানো গুল্ম বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানকার বন বিভাগেরই এক-জনের কাছে শুনেছি, এই লতাগুল্মের কাজ হচ্ছে বালির ঢিবিকে আষ্টেপৃষ্টে আঁকড়ে ধরে ঢেকে ফেলা, এবং শিকড় ছড়িয়ে বালির ঢিবিকে গ্রাস করা। তাতে যে শুধু বালিই উড়তে পারবে না, তা নয়, সামুদ্রিক বাতাসের এমন অদ্ভুত সর্পিলতা আছে যে, সে বালির ঢিবির গায়ে সুড়ঙ্গ সৃষ্টি করে। সেই সুড়ঙ্গ ভিতরে ভিতরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে হঠাৎ ফেটে যায়। ঢিবির বুকে গলির মত সৃষ্টি করে, আর সেই গলির ফাঁক পেয়ে বালি সেই পথ দিয়ে ছুটতে থাকে।

শুনে আমার মনে হয়েছিল প্রকৃতি একদিকে যেমন দেয়, আর এক দিক দিয়ে ছিনিয়ে নেবার জন্য সে হিংস্র আর কুটিল হয়ে ওঠে। তাই বোধ হয় মানুষের সঙ্গে তার সখ্যতা যত, সংগ্রামও তত। নিরবধি এই চলে আসছে।

হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। সূর্য অস্ত গিয়েছে। ছায়া নেমে আসছে। সিঁড়ির কাছে বড় আলোটা জ্বলে উঠেছে। এখনই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে। মেয়েদের ক্যাম্পে যাওয়া আছে। ফিরে যাওয়াই ভাল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে জোয়ার এসেছে। জল যেন ক্রমাগ্রসর। আমার পায়ের শব্দে লাল কাঁকড়াগুলো চোখের পলকে তাদের গর্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এ সময়টা আমার আরো অনেকক্ষণ সমুদ্রের ধারে কাটাতে ইচ্ছা করে। আজ উপায় নেই।

boiRboi.net

boiboi.net

ঠিক পথেই এসেছি। মেয়েদের ক্যাম্পটা চিনতে আমার ভুল হয়নি। বাইরের আলোটা তেমন উজ্জ্বল না। তবু বেশ কিছু মেয়েকে দেখতে পেলাম বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আর একটু কাছাকাছি হতেই বোধ হয় সীতা রায়ের গলাই শুনতে পেলাম, যাও, তোমরা ভেতরে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা সামনের বড় ঘরের মধ্যে চলে গেল। খোলা জানলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছিলাম সেই ঘরের মধ্যে নিয়নের আলো জ্বলছে। বাইরে সীতা রায় এবং ওর অধ্যাপিকা সঙ্গিনী মহিলারা। সকলেই এগিয়ে এলেন খানিকটা। সীতা রায় ডাকলেন, আসুন, অনীশবাবু।

আমি এগিয়ে বললাম, চলুন।

ওঁরা আমাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। মেয়েরা সবাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শান বাঁধানো মেঝেয় বসে ছিল। আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই উঠে দাঁড়াল। সীতা রায় আমাকে বললেন, বসুন আপনি।

দেখলাম, শুধু আমার জন্যই একটি আসন পাতা হয়েছে। তাও একটি বেড কভারকে কয়েক ভাঁজ করে আসন তৈরি হয়েছে। তা ছাড়া এখানে আসন পাওয়াই বা যাবে কী করে। আমি কিছু না বলে আসনটি হাতে তুলে মেঝেতে বসলাম। অধ্যাপিকারা সবাই আপত্তি করে উঠলেন। আমি বললাম, এখন আমরা সবাই সমান আমাদের এই রাজর রাজত্বে।

অধ্যাপিকাদের সঙ্গে মেয়েরাও অনেকে হেসে উঠল। সীতা রায় মেয়েদের বললেন, বস তোমরা।

আমি আসনটি হাত থেকে নামিয়ে রেখে সামনে মেয়েদের দিকে তাকালাম। পঞ্চাশ ষাটটি মেয়ে হবে। ওরা প্রায় সকলেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কারোর চোখে মুখে কৌতূহল, কেউ

কেউ যেন আমাকে একটু অবাক চোখেও লক্ষ্য করছে। কেউ বা নিতান্ত এমনিই তাকিয়ে দেখছে। সব মেয়ের মুখ দেখা আমার পক্ষে সম্ভব না। ওদের মিছিল করে আসার সময়, সেই দুষ্টু দুষ্টু মন্তব্যগুলো আবার আমার মনে পড়ে গেল। এদের মধ্যে সেই দু'তিনটি কারা, আমার পক্ষে চেনা সম্ভব না। এখন তো সব বসে আছে, যেন কতই ধীমতী শান্ত বাধ্য। আমার মনে মনে হাসি পেল। কেউ যেন ভাজা মাছটিও উল্টে খেতে জানে না।

সীতা রায় মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের আগেই বলেছি ইনি কে। ইনি অনীশ মিত্র, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।

এসব কথা শুনলেই আমি অস্বস্তিবোধ করি। এ ধরনের পরিচয় পেড়ে সভা-সমিতিগুলোতে যা অত্যন্ত সুলভ এবং নিতান্ত একটা নিয়ম, এবং তার সঙ্গে কিছু বিশেষণ জুড়ে অতিশয়োক্তি করা, এভাবে পরিচিত হতে ভারি লজ্জা বোধ করি। অথচ সে সময়ে কিছু বলারও থাকে না, ঢেঁকি গেলার মত অস্বস্তিতে চুপ করে বসে থাকতে হয়।

সীতা রায়ের কথা শেষ হতে না হতেই সামনের সারি থেকে কয়েকটি মেয়ে উঠে এগিয়ে আসবার উদ্যোগ করল। একজন সকলের আগে এসে আমার জোড়াসন করে বসে থাকা পদযুগল হাতড়ে খুঁজতে শুরু করল। আমি দ্বিগুণ অস্বস্তিতে বলে উঠলাম, আরে, এ আবার কী। এসব করতে হবে না।

সীতা রায়ই রক্ষা করলেন। বললেন, তোমাদের সবাইকে উঠে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে না। তোমরা যে যার জায়গায় বসে, কপালে হাত ঠেকালেই, উনি তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করবেন।

মেয়েরা বাধা পেয়ে আবার যে যার জায়গায় বসে পড়ল। সকলে একসঙ্গে কপালে হাত ঠেকাল। আমিও হাত তুলে কপালে ঠেকালাম। যদিও 'প্রণাম গ্রহণ' কথাটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না। এ ধরনের নিয়মানুবর্তিতা বা ফর্মালিটিতে, স্বাভাবিক আর সহজ অবস্থাটা যেন কেমন কৃত্রিম হয়ে পড়ে। যদিও বুঝি

শিক্ষিকা বা অধ্যাপিকারা এ সব বিষয়ে আবার একটু বেশি সচেতন। বিশেষ করে তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপারে।

সীতা রায় আবার বললেন, তোমরা কেউ ওঁর কবিতা পড়েছ ?

সমস্বরে কয়েকটি গলা একসঙ্গে বলে উঠল, আমি পড়েছি, আমি পড়েছি।

কেউ কেউ আমার কয়েকটি সংকলনের নামও বলল। ওরা ক'জন আমার কবিতা পড়েছে তার হিসাব করতে পারলাম না। যারা পড়েনি, তারা যেন একটু অপ্রস্তুত। কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, নীচু করে ফেলেছে।

সীতা রায় আবার বললেন, এখন তোমরা মোটামুটি বড় হয়েছ, বড় হতে চলেছ, কলেজে পড়ছ। যারা পড়নি, তারা অনীশবাবুর কবিতা পড়তে শেখ।

আমি না বলে উঠে পারলাম না, এটা বোধহয় ঠিক বললেন না। কবিতা কেউ পরের কথায় পড়ে না। নিজের ইচ্ছায় পড়ে।

সীতা রায় একটু হেসে বললেন, তবু কবিতা পড়ানো শেখাতে হয়। পথটা দেখিয়ে দিতে হয়। বুঝতেই পারছেন, আমরা আবার মাস্টারনী লোক তো!

সীতা রায় এবং তাঁর সহযোগিনীরা সকলেই হেসে উঠলেন! আমাকে তাঁর কথাটা অল্পাধিক মেনে নিতে হল। তিনি আবার মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, তবে এটাও বোধহয় তোমরা জানো, উনি শুধু কবি নন, বিশিষ্ট পণ্ডিতও বটে। ভারতীয় সঙ্গীতের ওপরেও উনি অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, বইও আছে।

দু-তিনটি মেয়ে বলে উঠল, জানি। পড়েছি।

সীতা রায় বললেন খুব ভাল। তা ছাড়া—।

আমি সীতা রায়ের দিকে পাশ ফিরে মুখ তুলে তাকালাম। আমার চোখে সনির্বন্ধ অনুরোধ। বললাম, থাক না।

সীতা রায় হাসলেন, বললেন, আপনার হয়তো খুব অস্বস্তি হচ্ছে কিন্তু আপনারা জানেন না, আপনাদের সম্পর্কে পাঠকদের কী অসীম

কৌতূহল। যাই হোক, আমি আর বেশি কিছু বলব না। মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, আমি খালি আর একটি কথাই বলব। যাঁকে আমরা কবি আর সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞানী বলে জানো, ব্যক্তিগত জীবনের পেশায় তিনি একজন মস্তবড় এঞ্জিনিয়র।

যাক, আর কিছু বাকী রইল না। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে মনে হল, ওদের কৌতূহল যেন আরো বেড়েছে এবং উৎসাহ বোধ করছে। এর পরের ব্যাপারটা কী কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে কি বক্তৃতা করতে হবে নাকি! তা হলেই গিয়েছি। ওটা আমার একেবারেই আসে না। বিশেষ করে এই বয়সের মেয়েদের সামনে।

সীতা রায় মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, ওঁকে পেয়ে আমরা সকলেই খুশি। তোমরা কেউ ওঁর একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাও। কে পারবে? তুমি—তুমি সর্বাণী পারবে?

মাঝখানের সারি থেকে একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পারব সীতাদি।

মেয়েটি—যার নাম সর্বাণী, সে একবার চকিতে আমার দিকে লজ্জিত চোখে তাকাল। ঠোঁটের কোণে হাসিটিও লজ্জার। আমার একটু কৌতূহল হল। কত আর মেয়েটির বয়স হবে। সতেরো? খুব বেশি হলে আঠারো। ও আমার কী কবিতা আবৃত্তি করবে? তাও আবার আবৃত্তি, পড়া নয়! একটু অবাকই লাগছে।

সর্বাণী বলল, আমি যে কবিতাটি আবৃত্তি করছি, তার নাম, 'শুনে যাও, সেই কথাটি'।

আমার বুকের মধ্যে প্রায় ধ্বক করে উঠল। অনেক দিন পরে যেন হঠাৎ পুরানো স্মৃতির মত কবিতার নামটি মনে পড়ল। আমার কবিজীবনের প্রায় প্রথম দিকের একটি প্রেমের কবিতা। তারুণ্যের তারল্যে নয়, তারুণ্যের মধ্যেও যে একটি বিবাগী গাম্ভীর্য থাকে, এ নামের কবিতাতেও তাই আছে। আমি মাথা নিচু করে গালে হাত দিয়ে বসে রইলাম। সর্বাণীর গলায় আমার কবিতা শুনছি।

মুখ তুলে তাকাতে যেন কেমন সংকোচ বোধ করছি। কেন না আমি জানি, এখন অধিকাংশই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে যেমন চিক চিক করে হঠাৎ জোনাকি জ্বলে ওঠে, আমার মনের মধ্যে একটি মুখ যেন তেমনি হঠাৎ জ্বলে উঠছে। আশ্চর্য, জীবনে এমন ঘটনা কোনদিন ঘটেনি। কোন মুখই আমার ঘুমিয়ে থাকা মনের অন্ধকারে এমন জোনাকির মত জ্বলে ওঠেনি। আর আজ এই চল্লিশ-ছুঁই-ছুঁই মনে এ আবার জীবন দেবতার কী খেলা!

এ কি ডাইনীর মায়া নাকি। যে পিছনে বসে, অন্ধকারে বিকট মুখে মন্ত্র জপে, আগুনের চুল্লিতে ছুড়ে ছুড়ে দেয় ধূলি, মৃতের মাংস, সাপের কঙ্কাল, বানরের করোটি, আর তার প্রাণ হরণীয়া প্রতিনিধি, অন্য বেশে, সামনে হাতছানি দিয়ে, চোখের ইশারায় ভুলিয়ে নিয়ে যায়। তাছাড়া একে আর কী বলব। আদিবাসীদের গল্পে শুনেছি, ওদের সাতবাহিনীর রূপকথা। সাত বোন, সাত পরী। ওরা সহসা এসে দাঁড়ায় পুরুষের সামনে। পুরুষ মুগ্ধ হয়ে পড়ে। মুগ্ধতা থেকে উন্মাদনা। তখন সাতবাহিনী সেই পুরুষকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় গভীর জঙ্গলে, পাথর পাড়ের জলাশয়ে। তারপরে যখন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় তখন সে হয় উন্মাদ অথবা মৃত।

এসব সত্যি কী না জানি না। কিন্তু একথাগুলোই আমার মনে আসছে। তা না হলে একটি মুখ সহসা এমন জোনাকির মত আমার মনের অন্ধকারে জেগে উঠছে কেন। এ কি কখনো সম্ভব। নাকি, নিতান্তই সামুদ্রিক বাতাসের তুক। মনে মনে হাসিও পাচ্ছে। তবু এ কথাও ঠিক, সেই মুখটির দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন কেমন চমকে চমকে উঠছি। এখন আমার নিজের কবিতা শুনতে শুনতে সেই মুখটি আরো ঘন ঘন জ্বলে উঠছে। ডস্টয়েভস্কির সেই কথাটা মনে পড়ছে, আমাদের বাস্তব ধারণার থেকে জীবন অনেক বেশি অপ্রাকৃত। তিনি অলৌকিকতার কথা কিছু বলেননি। কিন্তু আমার এই মনোভাবকে তাই বলতে ইচ্ছা করছে।

অথবা এ সবই একটা অলীক চিন্তা, মস্তিষ্কের অলস-কল্পনার চকিত ঝিলিক। মেয়েটিকে আমি তো জীবনে কোনদিন দেখিওনি। আজই প্রথম দেখছি, এবং এই ঘরেই। প্রথম বর্ষের ছাত্রী মানে আমার থেকে অনেক ছোট। কুড়ি বছরের তো বটেই। এই ঘরেরই দ্বিতীয় সারির বাঁদিকের এক পাশে বসে আছে। মেয়েটির আয়ত কালো চোখের তারা আমার দিকে নির্নিমেষ। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি। ও কি আমার চেনা? এমন মুখ কি আমি আর কোনদিন দেখিনি! কেবলই মনে হচ্ছে ওকে আবার দেখি। প্রথম কয়েকবার তাকাবার পরেই আমি নিজের মধ্যে সচেতন হয়ে উঠেছি। কেবলই মনে হচ্ছিল, এই দেখাটা চোখ থেকে ক্রমেই যেন মনের মাটিতে চুঁইয়ে ঢুকছে। আমার এতদিনের মন যেন গরম হয়ে উঠেছে।

অথচ এই মেয়েটি যে কখনো আমার নাম শুনেছে, তা মনে হয় না। ও একবারও বলেনি আমার কবিতা পড়েছে। ও কি আমাকে বিদ্রূপ করছে মনে মনে। নাকি অকপট শিশুর মত মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে।

আমি নিজেই নিজেকে ব্যঙ্গ করে হাসলাম। বললাম, অনীশ মিত্র, থাম। তোমার মনে বোধহয় কোন নতুন কবিতার জন্ম হচ্ছে। সৃষ্টির এ রকম একটা অবস্থা শিল্পীদের পক্ষে কখনোই স্বাভাবিক না। এ সময়ে কোন লোকই তাকে দেখে বুঝতে পারে না। কারণ, সে সময়ে সে এত ক্ষ্যাপা, খুঁজে ফিরে, পেয়ে যাওয়ার ক্ষ্যাপামি। অতএব, আঁধার ঘোচাও। তালে বাজো।

কবিতা আবৃত্তি শেষ হল। মুখ তুলে দেখলাম, সবাই প্রায় আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি সর্বাণীর দিকে চেয়ে বললাম, তোমার স্মৃতিশক্তিকে প্রশংসা না করে পারি না। বেশ ভাল আবৃত্তি করেছ।

সীতা রায় বললেন, এবার তোমরা অনীশবাবুর কাছে কী চাও বল। তোমাদের ইচ্ছা মত বল। বেশি কিছু বলে বিরক্ত কর না।

সর্বাণীই আবার উঠে দাঁড়াল। বলল, আমরা ওঁর মুখ থেকে ওঁর কবিতার আবৃত্তি শুনতে চাই।

এই কথার ফাঁকেই, আমি চকিতে একবার সেই মুখটি দেখলাম। সে তেমনি করেই আমার দিকে চেয়ে আছে। লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির মোনালিসার ঠোঁট টেপা হাসির একটা গূঢ় অর্থের কথা শুনেছিলাম। এ হাসি ঠিক সে হাসি না, আমি এ হাসির অর্থ ঠিক জানি না। সর্বাণীর দিকে চেয়ে বললাম, তবেই তো আমাকে মুশকিলে ফেললে। আর যাই কর, আমার কবিতা আমাকে আবৃত্তি করতে বল না। অন্য কবিদের কবিতা আবৃত্তি করতে বল তো, তা পারি। নয় তো তোমাদের গল্প শুনিয়ে দিতে পারি।

হঠাৎ কয়েকটি গলা একসঙ্গে বেজে উঠল, গল্প গল্প।

আমি সীতা রায় এবং তাঁর সঙ্গিনীদের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। তাঁরাও হাসলেন। বললাম, গল্পের বাজার কেমন চড়া দেখুন।

সীতা রায়ের সঙ্গিনী এক অধ্যাপিকা বললেন, আপনি কি গল্পও লেখেন নাকি ?

ঘাড় নেড়ে বললাম, না ওটা পারিনি। পড়তে ভালবাসি।

আমি এখন অনেকটা সহজ বোধ করছি। মেয়েদের দিকে ফিরে বললাম, তোমরা এসেছ ক্যাম্প করতে। অতএব এখানে ফর্মাল সভা-টভা ভাল লাগবে না। আমি এসেছি তোমাদের সঙ্গে একটু গল্পগুজব করতে। কিন্তু আর একটা জিনিস তো চাই। সেটা না হলে যেন কিছুই মানায় না। আর সেটা তোমাদের দ্বারাই সম্ভব।

সকলেই একটু অবাক কৌতূহলিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি সেই চোখ দুটির দিকেও চকিতে একবার দেখে নিলাম। একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম, এরকম একটা আসরে একটু গান হওয়া কি উচিত না ? আমি চাই তোমরা কেউ তা শোনাও।

মেয়েরা কেউ কেউ হঠাৎ যেন বিব্রত হয়ে পড়ল। লজ্জা পেয়ে, নিজেদের দিকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হেসে উঠল। অর্থাৎ, এই সব মেয়েরা গান জানে। তা সে যে রকমই হোক। আমি সীতা

ায়ের দিকে তাকালাম। সীতা রায় বললেন, খুব ঠিক কথা বলেছেন। অনীশবাবু শুনতে চেয়েছেন, তোমাদের মধ্যে যে ভাল গান জানো, গাও।

কোন সাড়া নেই। আবৃত্তির বেলায় ঠিক এরকম হয়নি। গান গাইতেই যত লজ্জা। হঠাৎ, হঠাৎ-ই দেখি, সেই মেয়েটিকে একজন গায়ে ঠেলা দিয়ে বলছে, তুই কর না, তুই ভাল গাইতে পারিস তো।

মেয়েটি বান্ধবীর দিকে ওর আয়ত কালো চোখের তারায় ভ্রূকুটি করে বলল, কী হচ্ছে। বলেই সে আবার আমার দিকে তাকাল। আবার ঠোঁটের কোণে হাসি।

এবার সীতা রায় নন, আর একজন অধ্যাপিকা বললেন, টুকু গাও না, তুমি তো গাইতে পারো শুনেছি।

টুকু! এটা নিশ্চয়ই পোশাকি নাম নয়। কিন্তু শুনতে ভাল লাগল। টুকু নাম কাদের রাখা হয়, আমি জানি না। জন্মাবার সময় যাদের টুকটুকে দেখতে হয়, তাদের নাকি। টুকু নিশ্চয় এই কলেজের ছাত্রী, যিনি ওকে গাইতে বললেন। ও বলল, নীলিমাদি এখানে গাইবার মত গান আমি জানি না।

গানের আবার এখান-ওখান আছে নাকি! আছে নিশ্চয়ই, এখানে বোধ হয় হিন্দী ফিল্মের হালকা আর চটুল গান ঠিক মানাবে না। অথবা তথাকথিত বাঙলা আধুনিক যাকে বলে। মেয়েটি কি সেইরকম কিছু বলছে নাকি? তবে খুব একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও বোধ হয় এখানে ঠিক জমে উঠবে না।

যিনি নীলিমাদি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে আবার কী গান, যে এখানে গাওয়া যাবে না? শুনেছিলাম, তুমি কোন্ গানের কমপিটিশনে প্রথম হয়েছিলে?

টুকু চকিতেই একবার আমার দিকে দেখে নিল, খানিকটা লজ্জিত ভাবে নীলিমার দিকে চেয়ে বলল, সে তো ভজন গান।

মনে মনে ভাবলাম, সে তো উচ্চাঙ্গ পর্যায়েরই। তবে ভজন কিছুটা সীমিত, যদি না খেয়ালের দিকে গিয়ে একটু ঠুংরিতে হয়।

সীতা রায় বলে উঠলেন, তোমরা রবীন্দ্র সংগীত জানো না কেউ ?

আমি অন্য মেয়েদের দিকে চোখ তুলতেই গিয়ে টুকুর নির্নিমেষ চোখে যেন আটকে গেলাম। আর আমার ভিতর থেকে একটা অপ্রতিরোধ্য বেগেই যেন বেরিয়ে এল, বেশ তো, ভজনই হোক না। কার ভজন ?

টুকু এই প্রথম বোধ হয় চোখের পাতা নামাল, ঠোঁটের কোণে হাসিটি স্থির।

শোনা গেল, মীরার ভজন।

বললাম, শোনাই যাক না। তোমরা কী বল ?

অন্য মেয়েদের দিকে ফিরে তাকালাম। সকলেই প্রায় ঘাড় নাড়ল। আমি আবার বললাম, এর পরে যে গাইবে, সে রেডি হয়ে থাক। রবীন্দ্রনাথ বা অতুলপ্রসাদ, যাঁরই হোক, একটা গান শুনব।

আমার কথা শুনেই তৃতীয় সারির দুটি মেয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে হেসে উঠল। একজন আমার দিকে চেয়ে বলল, ও খুব ভাল অতুলপ্রসাদের গান জানে স্যার।

স্যার! একে বলে ছাত্রী। অভ্যাস যেতে চায় না। সীতা রায় বললেন, ঠিক আছে। এর পরে ঋতা অতুলপ্রসাদের গান গাইবে। টুকু, তুমি শুরু কর।

টুকু মাথা নিচু করেছিল। বোধহয় ভাবছিল, কী গান করবে। ও আবার চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। এই মুহূর্তে আমি যেন ঠিক ওর বর্ণনা দিতে পারছি না। শরীরের রঙ ? সুবর্ণমণ্ডিত বলা যায় না, ফরসা সন্দেহ নেই। বিশ্ব ঘুরে ভারতের মত বিচিত্র রঙ তো আর কোথাও দেখিনি। ফরসার মধ্যেও অনেক রকমারি আছে, যার সঠিক বর্ণনা দেওয়া যায় না। অনেক দেশ ঘুরে কিশোরী যুবতীদের স্বাস্থ্যের রকমও অনেক দেখেছি। সে হিসাবে টুকুর শরীর কি একটু উদ্ধত! তাও আমি সঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু এ রকম দু'টি চোখ অথবা ঠোঁটের কোণের হাসি আমি আর কোথাও দেখেছি কী না মনে করতে পারি না।

ওই চোখ দুটিকে আমি কী বলব? হয়তো কখনো কবিতার ভাষায় কিছু মনে আসবে। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, কী একটা দূর পারের রহস্য যেন আছে। অথচ যে চোখে এমন রহস্য থাকে, তার বয়সটা যেন টুকুর না। অথবা আমি ভুল দেখছি। ওই চোখ হয়তো নিতান্ত একটি সতেরো আঠারো বছরের মেয়ের সহজ সরল দৃষ্টি। বলা যায় না, আমি হয়তো কোন ভুকের ঘোরে আছি।

টুকু গান শুরু করল। গলাটা সত্যি মিষ্টি, ঝংকারটা যেন একটু কষে বাঁধা তারের মত টান টান। কতখানি সাধা গলা জানি না, স্বরের মধ্যে কোন জড়তা বা অস্পষ্টতা নেই। ঠুংরিতেই ভজন গাইছে, কিন্তু আমার মনটা কেমন যেন অতৃপ্ত বোধ করছে। এ ভজনে ভক্তি জাগে না, সেই আবেশ আনতে পারছে না, অন্তত আমার মনে। সমস্ত গায়কীর মধ্যে একটা স্পষ্ট চঞ্চলতার ছাপ। অথচ এ কথাও মানতেই হয়, সুরে কোথাও গলদ তো নেই-ই, ছোট ছোট কাজগুলো অপূর্ব নিপুণ, বিস্ময়করও বলা যায়। এ রকম গান কোন কোন সময়ে খুব ভাল হিন্দী গায়িকার, ফিল্‌মের গানেই শোনা যায়। হিন্দী ফিল্‌মের গান যতই অপছন্দ করি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, সেই সব গায়িকার গলা অত্যন্ত দামী। কিন্তু তাঁরা বোধ হয় নিরুপায়। যে-সব গানের ভাষায় তাঁদের গাইতে হয় আর যে সব বিশ্বজোড়া জগাখিচুড়ি সুরে টাকা এবং গণদেবতার মুখ চেয়ে, তাঁরা বোধহয় গাইতে বাধ্য। আমি আরো লক্ষ্য করে দেখছি, টুকু তালেও নির্ভুল। আমি মাথা নিচু করে শুনছি, আঙুলে তাল রেখে চলেছি।

টুকু প্রায় দশ মিনিট ধরে গানটা গাইল। আরো লক্ষণীয়, গান গাইবার সময় ওর মুখ থাকে অবিকৃত। অনেক সময় যেটা অনেক ভাল গায়ক গায়িকার পক্ষেও সম্ভব হয় না। গান শেষ হলে টুকু প্রথমেই আমার দিকে তাকাল, এবং মুহূর্তের মধ্যেই ওর ঠোঁটের কোণে সেই হাসিটি ফুটে উঠল, যে হাসিটি এতক্ষণ ছিল না। কেউ কিছু বলল না দেখে আমি বললাম, খুব মিষ্টি গলা, গলার কাজও খুব ভাল আছে।

টুকুর চোখ একটু দীপ্ত হল, একটু যেন লজ্জাও পেল।

নীলিমাদি বললেন, বেশ ভাল হয়েছে, ঠিক যেন রেকর্ডের গানের মত।

সীতা রায় বললেন, এবার ঋতা গাও।

ঋতা একটু সময় মাথা নীচু করে রইল। তারপরে আমার একটি অত্যন্ত প্রিয় গান ধরল, 'ওগো নিঠুর দরদী, এ কি খেলা খেলছ অনুক্ষণ—কাঁটায় ভরা বন তোমার, প্রেমে ভরা মন'। ওর গলাও ভাল, কিন্তু টুকুর মত মিষ্টি বা পরিচ্ছন্ন স্বর না। গায়কীটি ভারি অপূর্ব আর ভাবময়। সত্যি, আমরা কাদের কতটুকু খবর রাখি। কত ছেলেমেয়ের মধ্যে কত গুণ লুকিয়ে রয়েছে। সারা জীবনেও হয়তো কখনো জানা যায় না।

ঋতার গান শেষে এল আমার পালা! মেয়েদের মধ্য থেকেই কয়েকজন বলে উঠল, আমরা আপনার গল্প শুনব।

অধ্যাপিকারাও তাঁদের ছাত্রীদের সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরাও।

আমি তাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলাম। তারপর মেয়েদের দিকে ফিরে বললাম, আমি তোমাদের দুটো ছোট ছোট গল্প শোনাব। কোনটারই রচয়িতা আমি নই, আমি গল্প লিখতে জানি না। জমিয়ে বলতে ইচ্ছা করে, বিশেষ করে নীরস বক্তৃতার বদলে। প্রথম যে গল্পটা বলব, তার লেখক কে আমি জানি না। ওটা আমি এই দীঘাতে বসেই এক বৃষ্টির রাত্রে আমার এক পরিচিতের মুখে শুনেছি। ওটা হল ভূতের গল্প।

বলতেই কয়েকজন খুশিতে আওয়াজ করে উঠল। কে যেন বলল, আমার ভীষণ ভয় করে।

বললাম, তাহলে থাক।

সবাই এক সঙ্গে বলে উঠল, না না, আমরা শুনব।

বেশ। আর দ্বিতীয় গল্পের কথাটাও বলে রাখি, সেটা রবীন্দ্রনাথের গল্প। হয়তো তোমরা অনেকবার পড়েছ, তবু—।

একটি মেয়ে বলে বঠল, মণিহারা?

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? আগেরটা ভূতের গল্প বলে? না, মণিহারা নয়, একটি রূপকথা।

সবাই যেন একটু মিইয়ে গেল। ভাবখানা, রূপকথা! রূপকথা শোনবার বয়স কি আমাদের আছে? আমি মনে মনে হাসলাম। কেন না আমি জানি, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতই গুরুদেব ব্যক্তি। তিনি রূপকথার নামে সেই গল্পে বলেছেন মানব জীবনের এক বিচিত্র করুণ কাহিনী। বললাম, রূপকথা শুনে তোমাদের মন খারাপ করবার কিছু নেই। মনে হয় শোনার পরে তোমাদের ভালই লাগবে। যাই হোক, এবার আমি প্রথম গল্পটা শুরু করছি।

সীতা রায় বলে উঠলেন, তোমরা সবাই এগিয়ে এস।

আমি বলে উঠলাম, আর সেই সঙ্গে আমি একটা অনুরোধ করব, একটি মাত্র বাতি জ্বালিয়ে রেখে আর সবই নিভিয়ে দাও।

মেয়েরা বিশেষ ভাবে কৌতূহলিত এবং খুশি হয়ে উঠল। দুটি মেয়ে উঠে গিয়ে একটি বাদ দিয়ে সব আলো নিভিয়ে দিল। তার জন্য এত বড় হলঘরটা একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল না। একটি আলোতে সকলের ছায়াগুলো বড় হয়ে উঠল, একটা আবছায়া ভাব। সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছে, তবু একটা অস্পষ্টতা রয়েছে। মেয়েরা আমার কাছে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে। আমার মধ্যে একটু চমক লাগল। দেখলাম, টুকু প্রায় আমার বাঁ হাঁটুর কাছে। সেই নির্নিমেষ চোখে চেয়ে রয়েছে আমার মুখের দিকে।

আমি শুরু করলাম, 'ঘটনাটা ঘটেছিল একটা ফরেষ্ট অঞ্চলে। আমি জানি না, তোমরা কখনো ফরেষ্ট অফিস দেখেছ কী না। আমাদের দেশে জঙ্গলকে রক্ষা করার জন্য বনবিভাগের অফিস থাকে। সাধারণত এই সব অফিস হয়ে থাকে গভীর জঙ্গলের মধ্যেই অনেকখানি জমি পরিষ্কার করে। শুধু অফিস থাকে না, কর্মচারিদের থাকবার জন্য কোয়ার্টারও থাকে। কুলিকামিন, যারা নিয়মিত জঙ্গলকে পরিষ্কার রাখে, গাছ কাটে, তাদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। আর ফরেষ্টার, রেঞ্জার ইত্যাদির জন্য ছোটখাটো বাংলো।

'এখানেও তোমরা একটি ফরেস্ট বাংলো দেখেছ, তোমাদের ক্যাম্পের প্রায় বিপরীত দিকেই। এখানে জঙ্গল বলতে প্রায় কিছুই নেই। এখানকার ফরেস্ট বিভাগের কাজ বিশেষ করে, কেবল বালিকে আটকাবার জন্য, বিশেষ বিশেষ গাছ লতাপাতা লাগানো এবং রক্ষা করা। আমি যে ফরেস্টের কথা বলছি, তার চেহারা আলাদা।

'যাই হোক, আমি যে ফরেস্টের কথা বলছি সেখানে একটি ছোটোখাটো পুলিশের ফাঁড়িও ছিল। তোমাদের আগেই জানিয়ে রাখি, এসব অঞ্চলে ইলেকট্রিক লাইটের কথা কেউ চিন্তাই করতে পারে না। কুলিকামিনরা তো বলতে গেলে কেরোসিনের আলোও জ্বালাতে পারে না, এত গরীব। তারা যতক্ষণ জেগে থাকে, কাঠের গুঁড়ি জ্বালিয়ে সেই আলোতেই কাজ চালিয়ে নেয়। যারা একটু ভাল চাকরি করে, তারা কেরোসিন তেলের আলো ব্যবহার করে। কিন্তু তাতে সেই গভীর জঙ্গলে রাত্রির ঘোর অন্ধকার একটুও কাটে না।

'এই ফরেস্ট থেকে চার মাইল দূরে রেল লাইন আছে। সেই রেল লাইনের গা ঘেঁষে কয়েকটি কাঠ চেরাইয়ের করাতকল, কাঠের ঠিকাদারের বাড়ি, আরো সব নানান্ রকমের ব্যবসায়ী, কুলিকামিন ইত্যাদি বাস করে। একটি বাজারও আছে। কিন্তু সপ্তাহে একদিন মাত্র হাট হয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা সেই হাট থেকে বাজার করে নিয়ে আসে, সাতদিন ধরে চালায়। এই যে চার মাইলের কথা বললাম, এই রাস্তাটা পাকা এবং বাঁধানো। লরি ট্রাক সবই চলতে পারে। রাস্তার দু' পাশেই গভীর জঙ্গল। শাল সেগুনই বেশি। চার মাইলের মধ্যে, রাস্তার ধারে দু-তিনটে ঝুপড়ি আছে। কেউ হয়তো চা তৈরি করে। জঙ্গলের কুলিকামিনরা সুযোগ পেলে সেখানে চা খেতে যায়।

'জায়গাটার বর্ণনা আগেই তোমাদের দিয়ে রাখলাম, যাতে গল্পটা বুঝতে তোমাদের সুবিধা হয়। ফরেস্টের যে নতুন রেঞ্জার এসেছে, সে আবার একটু খেলাধূলার ভক্ত। বয়সও কম। ধরে নাও সে আমার বন্ধু, তার নাম অমল, এবং সে-ই যেন আমাকে গল্পটা বলছে

আমার এক বন্ধু বলে উঠল, অমল, আজ বেলা তিনটেয় অমাবস্যা পড়েছে। রাত্রিটা ভাল না। আজ রাত্রিটা এখানেই থেকে যাও।

'কিন্তু আমার কোন উপায় ছিল না। পরের দিন ভোরবেলাই আমার একটা বিটে যাবার কথা। কুলিকামিনরা অন্ধকার থাকতেই সেখানে বেরিয়ে যাবে। বললাম, কোন উপায় নেই। কাল ভোরেই আমার বিশেষ জরুরি কাজ আছে। কিছুই হবে না, আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব।

'বন্ধুরা সকলে মিলেই বাধা দিল, "কী দরকার, একটা রাত বৈ ত নয়। এই অমাবস্যার অন্ধকারে আজ না-ই গেলে।"

'বললাম, "এ রকম অন্ধকারে আমি বহুদিন ফিরে গিয়েছি। আজ আবার নতুন নাকি!"

'বন্ধুরা বলল, "কিন্তু সে সব রাত্রি অমাবস্যার ছিল না।"

'আমি বললাম, "ওসব অমাবস্যা-টমাবস্যা আমি মানি না। আমার ভাই কাজ আছে। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব। চললাম।" বলেই আমি উঠে পড়লাম।

'তবু বন্ধুরা অনেক করে বলতে লাগল। আমি ওদের সান্ত্বনা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে দিলাম। দু' মিনিটের মধ্যেই পাকা রাস্তায় এসে পড়লাম।

'প্রচণ্ড শীত থাকলেও আমার গা তখনো বেশ গরম। কেননা, আমি অনেকক্ষণ খেলেছি।....

'রাস্তাটা অন্ধকার। দু'পাশে গভীর জঙ্গল, মাথার ওপরে অল্প অল্প কুয়াশা ঢাকা ঝাপসা আকাশ। আমার সাইকেলে ডায়নামো লাগানো আলো ছিল। রাস্তা দেখে যাবার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু....হ্যাঁ, কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে আমার মনে হল আমার সাইকেলটা যেন চলতে চাইছে না, কেউ পিছন থেকে টেনে রাখতে চাইছে। অবাক হয়ে পিছন ফিরে দেখলাম, কেউ নেই। ভাবলাম, আসলে কিছু না। আমি টায়ার্ড বলেই এ রকম মনে হচ্ছে। আমি জোরে প্যাডেল করতে লাগলাম। কিন্তু আশ্চর্য, যত জোরেই

প্যাডেল করি, কেবলই মনে হচ্ছে সাইকেল যেন কিছুতেই এগোতে চাইছে না। কেউ যেন সাইকেলটাকে পিছন থেকে জোর করে টেনে রাখছে।

'অনেক সময় সাইকেলের গিয়ারে বা চেনে কিছু আটকে গেলে এ রকম হয়। মাথা নিচু করে ভাল করে দেখলাম, সে-রকম কিছুই না। তবে এ রকম হচ্ছে কেন? সাইকেল চালাতে আমি যেন ঘেমে উঠছি। রাস্তায় একটাও লোকজন নেই। ডায়নামোর আলোটা ছাড়া চারদিকে গাঢ় অন্ধকার, আর শুধু ঝিঁঝিঁর ডাক। তবু আমি জোর করেই সাইকেল চালাতে লাগলাম।....

'হঠাৎ দেখলাম, ডায়নামোর আলোয় দুটো হাত—শুধু দুটো হাত, সামনের থেকে আমার সাইকেলের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরল। কালো লোমশ বড় বড় নখওয়ালা দুটো জন্তুর বীভৎস হাত এবং থাবা হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে পিছন দিকে ঠেলতে লাগল। আমি প্রথমটা চমকে উঠলেও ভয় পেলাম না, ভাবলাম কোন জন্তু জানোয়ারের হাত। আমার এক হাত তুলে জোরে সেই হাতের ওপর ঝাপটা মারতেই হাত দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু আমার হাতে কিছুই লাগল না। তা হোক, আমি আবার সাইকেল চালাতে লাগলাম। কিন্তু আবার সেই লোমশ থাবা আর হাত আমার সাইকেলের হ্যাণ্ডেলের ওপর চেপে ধরে পিছনে ঠেলতে লাগল।'....

এ সময়ে দেখলাম, ছাত্রীদের নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত পড়ছে না। এমন কি অধ্যাপিকাদেরও। সবাই যেন আমাকে ঘিরে আরও ঘন হয়ে এসেছে। টুকুর হাঁটু প্রায় আমার হাঁটুর কাছে ঠেকেছে। ও এবং সবাই আমার মুখের দিকে একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। ওদের গরম নিশ্বাস আমার গায়ে লাগছে। আমি আবার শুরু করলাম: 'কিন্তু এভাবে কতক্ষণ পারা যায়! যতই সেই জান্তব লোমশ বড়বড় নখওয়ালা হাতে ঝাপটা মারি সে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ঝপ্ করে আঁকড়ে ধরে ঠেলতে থাকে। আমি ক্রমাগত হাঁপিয়ে পড়তে লাগলাম।....এ সময়ে চোখে পড়ল, রাস্তার ধারে

গাছতলায় একটা ঝুপড়ি চালা ঘর। সেখানে টিম টিম করে একটা আলো জ্বলছে। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে একটা লোক পিছন ফিরে বসে আছে। পিছন দিকে উনুনে একটা পাত্রে জল ফুটছে। আমি সাইকেল থেকে নেমে সেখানে গেলাম। লোকটা মাথা মুড়ি দেওয়া চাদরের ভিতর থেকে আমার দিকে ফিরে তাকাল। আমি সাইকেলটা গাছের গায়ে ঠেকিয়ে রেখে তাকে একটু চা করতে বললাম। সে আমাকে বেঞ্চিতে বসতে বলল। আমি বসলাম না। একটা সিগারেট ধরালাম। লোকটা চা তৈরি করতে করতেই জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে বাবু আপনার? আপনি যেন হাঁপাচ্ছেন, এই শীতে ঘেমে গেছেন?"

বললাম, "হ্যাঁ, একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি।"

লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

'আমি তাকে ঘটনাটা বললাম, এবং সেই লোমশ জান্তব নখওয়ালা থাবা এবং হাতের কথা বললাম। লোকটা তখন আমার দিকে ফিরে চাদরের ভিতর থেকে হাত বের করে আমার সামনে তুলে ধরে বলল, "দেখুন, দেখুন তো, এ রকম হাত কী?" আমি চমকে উঠে দেখলাম ঠিক সেই রকম দুটো হাত আমার সামনে। পরমুহূর্তেই দেখি কোথায় সেই ঝুপড়ি চালা ঘর, টিমটিমে আলো, চা-ওয়ালা বা উনুনের ওপর জল ফোটা। কেউ নেই, চারদিকে অন্ধকার। আমি একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি। পাশে সাইকেলটা।'

এই পর্যন্ত বলে দেখছি, গল্পের শ্রোতৃমণ্ডলী প্রায় আমার গায়ে এসে ঠেকেছে, ঘিরে ধরেছে। ইতিমধ্যে দু-একটি ভয়ার্ত অস্ফুট শব্দও পেয়েছি। টুকু বোধহয় একবার আমার হাঁটু হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিল।

আমি বলতে লাগলাম: 'এই ঘটনার পরে আমার মনটা একটু খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি তাড়াতাড়ি আবার সাইকেল চালাতে লাগলাম। কিন্তু চালালে কী হবে, আবার সেই অবস্থা, একই ব্যাপার। ডায়নামোর আলোয়

হ্যাণ্ডেলের ওপর সেই কালো লোমশ জান্তব হাত জোর করে আমাকে পিছনে ঠেলতে লাগল। তবু আমি হার মানলাম না, চালাতে লাগলাম। কিন্তু এভাবেই বা কতক্ষণ পারা যায়, আমি ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছি।

'এই সময়ে চোখে পড়ল রাস্তার ধারে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, জঙ্গলের তিনজন কুলি কাঠের আগুন পোহাচ্ছে। ওরা আমাকে দেখেই চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

'তারপর আমার চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে বাবু? আপনাকে এ রকম দেখাচ্ছে কেন?" আমি সাইকেল থেকে নেমে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘটনাটা ওদের বললাম। সেই হাতের বর্ণনা দিলাম। ওরা তিনজনেই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চাদরের ভিতর থেকে তিনজনের ছ'টা হাত তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, "দেখুন তো, এ রকম হাত?" তাকিয়ে দেখি ঠিক সেই কালো লোমশ জান্তব তিন জোড়া হাত আমার চোখের সামনে। কোথায় আগুন, কোথায় কুলিরা। আমার চারপাশে কেউ নেই, চারদিক ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, দু'পাশে গভীর জঙ্গল।'

এইবার ভয়ার্ত অস্ফুট আর্তনাদটা আরো কয়েকজনের গলায় শোনা গেল। এমন কি একজন অধ্যাপিকারও। আমার হাঁটুর কাছে টুকু ট্রাউজারের ওপরটা চেপে ধরেছে। আমি গল্পটা শেষ করতে লাগলাম ঃ

'অবস্থা দেখে তখন আমার মন বেশ ভেঙে পড়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ আবার সাইকেলে উঠে জোরে চালাতে লাগলাম। কিন্তু হলে কী হবে, সেই কালো লোমশ থাবা আর হাত জোড়া, তেমনি করেই আমার হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে ঠেলতে লাগল। আমিও থামলাম না। জোর করেই প্যাডেল করতে লাগলাম। একটু পরেই আমাদের ফরেস্ট অফিস অঞ্চলের একটা আলো দেখতে পেলাম। এই একটি মাত্র আলো একটা কাঠের তৈরি সাঁকোর ধারে কাঠের

খুঁটির গায়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। তারপরেই পুলিশের ফাঁড়ি। একজন সেপাই সাঁকোর সামনে রাত্রে পাহারায় থাকে। তাকে দেখতে পেয়ে আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। সোজা তার কাছে গিয়ে সাইকেল থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে পড়লাম। সেও সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে রেঞ্জারবাবু ?" আমি তাকে ঘটনাটা বললাম। সে অবাক হয়ে শুনল। তারপরে সেই হাতের বর্ণনাও তাকে দিলাম। শুনে সে তার হাতের সোয়েটার সরিয়ে জিজ্ঞেস করল, "দেখুন তো, এ রকম হাত কী ?" হঠাৎ দেখি আমার চোখের সামনে আবার সেই দুটো কালো লোমশ হাত, আমার গলার কাছে এগিয়ে আসছে। সাঁকো আছে, আলো আছে, কিন্তু সেপাই নেই, কেউ নেই। হঠাৎ আমার মস্তিষ্ক একেবারে শূন্য হয়ে গেল। অজ্ঞান হয়ে সাঁকোর ওপরে পড়ে গেলাম।'

আমি চুপ করলাম। ঘরের মধ্যে একেবারে ভৌতিক স্তব্ধতা। নিশ্বাস ফেলতে বা নড়েচড়ে বসতেও যেন ভয় পাচ্ছে। টুকু তখন আমার ট্রাউজার মুঠি করে ধরেছে। ওর মুখটা প্রায় আমার বুকের কাছে। আরো কয়েকটি মেয়েও আমার গায়ের প্রায় সংলগ্ন। টুকু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'তারপর ?'

আমি হেসে বললাম, 'তারপর আর অমলের কিছু মনে নেই।'

দুটি মেয়ে ছুটে গিয়ে পটপট করে সব আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল। হলের মত বড় ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠল। সবাই যেন এক রুদ্ধশ্বাস ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পেল। সবাই একটু সরে সরে বসল, জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলল। নিজের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল, হাসতে লাগল। কোন কোন মেয়ে বলল, আজ রাত্রে তারা ঘুমোতে পারবে না, দরজা খুলে বাইরেও যেতে পারবে না। আমি টুকুর দিকে তাকালাম, তারপরে মুঠি করে ধরা আমার ট্রাউজারের দিকে। ও যেন একটু লজ্জা পেল। মুঠি ছেড়ে দিয়ে একটু সরে বসল। ও কতটা ভয় পেয়েছিল জানি না। এখন

দেখছি, আবার ওর চোখ দুটির তারায় সেই এক দূর পারের নিবিড়তা ফিরে আসছে, ঠোঁটের কোণে একটু হাসি, দৃষ্টি নির্নিমেষ।

সীতা রায় একটা দমকা নিশ্বাস ফেলে বললেন, দারুণ গল্প বলেছেন। আপনাকে কবি আর পণ্ডিত মানুষ বলেই জানতাম। এ রকম গল্প বলতে পারেন জানতাম না। আপনি গল্পও লেখেন না কেন? চমৎকার হবে।

হেসে বললাম, 'পড়তে ভালবাসি, বলতে ভালবাসি। লেখবার ক্ষমতা নেই। ওটা সকলের দ্বারা হয় না।'

এক অধ্যাপিকা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'পরের গল্পটাও এ রকম নাকি?'

ভদ্রমহিলা রীতিমত আতঙ্কিত দেখছি। বললাম, না, এটা রূপকথা—লেখক রবীন্দ্রনাথ।

সবাই আবার ঘন হয়ে এল। আমি সেই আষাঢ়ে গল্পটি বললাম, ঠাকুমা বলছে নাতিকে, বর্ষা দিনের সন্ধ্যায়। যে গল্পের নায়িকা তরুণী রাজকুমারী এবং তার ছোট্ট বর তালপাতা বগলে নিয়ে ইস্কুলে যায়, রাজকুমারীর থেকে অনেক ছোট। কেননা, রাজকন্যার বিয়ে হয় না বলে রাজা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন পরের দিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে যার মুখ দেখবেন তার সঙ্গেই কন্যার বিয়ে দেবেন, এবং ইস্কুলে যাবার পথে একটি ছোট বালককেই দেখেছিলেন। রাজার প্রতিজ্ঞায় বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সেই বালককে ওর ইস্কুলের বন্ধুরা রোজ জিজ্ঞেস করে, রাজকন্যা তার কে হয়। সে বলতে পারে না, রাজকন্যাকে এসে জিজ্ঞেস করে, সে তার কে হয়। রাজকন্যা মুখ টিপে হাসে, বলে, একদিন বলবে। এমনি করতে করতে ছোট্ট বর আর থাকতে পারে না। রাজকন্যা একটা দিন ঠিক করে বললে, আজ সে বলবে, সে বালকের কী হয়। রাজকন্যা সেদিন রাজবাড়ি ফুল দিয়ে আলো দিয়ে সাজাতে বলল। ফুল দিয়ে বাসরঘর তৈরি করতে হুকুম দিল। তার ছোট্ট বরের জন্য নিজের হাতে রাঁধল, সুন্দর করে সাজাল। নিজেও অনেক হীরে জড়োয়ায় সাজল। সন্ধ্যে-

বেলা বরকে নিজের হাতে খাইয়ে, হাতে ফুল দিয়ে সাজানো বাসর ঘরের খাটে শুইয়ে দিল। ঘরে ধূপ দীপ সুগন্ধে ভরা। বর জিজ্ঞেস করল, বলবে না? রাজকন্যা বলল, আমি খেয়ে এসে বলব।....

রাজকন্যা যখন খেয়ে এল তার ছোট্ট বর তখন নিদ্রিত। জাগাবার জন্য তার গায়ে হাত দিল। দেখল, গা ঠাণ্ডা। পাশ ফিরিয়ে বুকে হাত দিয়ে দেখল, কোন শব্দ নেই। একটি কালনাগিনী তার বুকের কাছ থেকে বেরিয়ে, খাট থেকে নেমে গেল। সে মৃত।....

রাজকন্যার চোখের সামনে সমস্ত আলো অন্ধকার হয়ে গেল, ধূপবাতির গন্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠল, ছোট্ট বরের বুকের কাছে মুখ নিয়ে কেঁদে বলল, আমি তোমার কে হই, সে কথা যে বলা হল না।

গল্পের শ্রোতা নাতি জিজ্ঞেস করল, তারপর? ঠাকুমা বললেন, তারপর তো আর শেষ নেই ভাই।

গল্পটা শেষ করে দেখলাম, সব মুখগুলোই যেন চকিত ব্যথায় করুণ হয়ে উঠেছে। এমন কি, কয়েকজনের চোখ ছলছল করছে। অথচ রূপকথা শুনে চোখ ছলছলাবার বয়স এদের নেই। কিন্তু আমি জানি, এই রূপকথাটির আবেদন ভিন্ন। এই বয়সেও গল্পটা বলতে গেলে শেষের দিকে আমার গলা কেঁপে যায়। বুক টনটন করে। তা ছাড়া, এই রূপকথার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনেরও যেন এক গভীর অর্থ ফুটে উঠেছে।

টুকুর দিকে আমার চোখ পড়ল। ওর চোখে মুখে ব্যথার চেয়ে যেন মুগ্ধতাই বেশি। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন লাগল?'

টুকু ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'চমৎকার।'

আমি অন্য মেয়েদের দিকে তাকালাম। সকলেরই এক অভিব্যক্তি। অধ্যাপিকাদেরও। তাঁরা কয়েকটি উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করলেন। আমি বললাম, 'আমি এটাকে একটি রূপকথাই শুধু মনে করি না। ডস্টয়েভস্কি যেমন বলেন, জীবন আমাদের বাস্তববোধের থেকেও অপেক্ষাকৃত বিস্ময়কর, অপ্রাকৃত, এই রূপকথা যেন আমাদের সেই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন ছোট্ট শিশু বর, তেমনি বধূ।

জীবন ছকে বাঁধা নয়। কিন্তু যা চাই, জীবনে তাও পাওয়া যায় না। কোথায় কোন্ আকস্মিক আঘাত বা দুঃখ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে, আমরা জানি না। এবং আরো একটি কথা, নাতি যখন জিজ্ঞেস করে, তারপর? ঠাক্‌মা বলেন, 'তারপরে আর শেষ নেই।' শুনে এই কথাই বলতে ইচ্ছে করে, মানুষের জীবনের শেষ কোথায়। সে অশেষ, তার কোন 'তারপর' বলে কিছু নেই।'

সীতা রায় বলে উঠলেন, 'অপূর্ব ব্যাখ্যা। একটি রূপকথা থেকে যে এ ব্যাখ্যা হয় তা কোনদিন বুঝতে পারিনি। আপনার কাছে ছাড়া এ ব্যাখ্যা আর কারোর কাছে শুনতে পেতাম না।'

আমি লজ্জিত হেসে বললাম, 'তার কোন মানে নেই।'

একজন অধ্যাপিকা বললেন, 'লিলি, এবার তোমাদের যা করণীয়, তাই কর।'

কয়েকটি মেয়ে উঠে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি বললাম, 'এবার ওঠা যাক।'

সীতা রায় হেসে বললেন, 'আর একটু বসুন।'

মেয়েরা বলল, 'আরো গল্প শুনতে ইচ্ছা করছে।'

সীতা রায় হেসে বললেন, 'একদিনেই সব শুনে নিতে চেও না। আবার ওঁকে আমরা নিয়ে আসব।'

আমি মনে মনে প্রমাদ গণলাম। কয়েকটি মেয়ে আমার জন্য দুটি প্লেটে নানান্ রকম খাবার আর জলের গেলাস নিয়ে এল। আমি বিশেষ বিব্রত হয়ে উঠলাম। বললাম, 'এসব আবার কেন? এখন যে কিছুই খাই না।'

মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল, 'একটু খেতেই হবে। আমরা ছাড়ব না।'

নিরুপায়। টুকুর দিকে চেয়ে দেখলাম, ও তাকিয়ে আছে। আমার মনের মধ্যে চমকটা যেন বাড়ছে। সেই ওর নির্নিমেষ দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে হাসি। বলল, 'না খেলে আপনাকে যেতেই দেব না।'

একটি মেয়ে বলে উঠল, 'তুই যেতে না দেবার কে রে টুকু? তুই

boiboi.net

তো আর রাত্রে ক্যাম্পে থাকবি না। তুই তো ট্যুরিস্ট লজে ফিরে যাবি তোর মায়ের কাছে। আটকে রাখলে, আমরাই রাখব।'

আমি হেসে বললাম, 'তাই বুঝি, তোমার মা আছেন সেখানে?'

টুকু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, মা-ও বেড়াতে এসেছে।'

এমন সময় সর্বাণী বলে মেয়েটি বলে উঠল, 'সীতাদি, অনীশবাবুর সঙ্গে আমরা রাত্রের খাবার খাব।'

সীতা রায় বললেন, 'খুব ভাল হয়। ওঁকে তোমরা খাইয়ে দাও।'

আমি বলে উঠলাম, 'না না, আজ আর তা সম্ভব না। আমার রান্না ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। সে সব নষ্ট হবে।'

সর্বাণী বলল, 'হোক না, তাতে কী।'

সীতা রায় বললেন, 'তাহলে থাক, আজ রাত্রের মত ছেড়ে দাও। আগামী কাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আসছেন তোমাদের ক্যাম্প দেখতে। উনি দুপুরে এখানে খাবেন, অনীশবাবুরও নিমন্ত্রণ।'

মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল, 'তবে তা-ই!'

এটা ঠিক চাইনি। এদের সঙ্গে আমার খারাপ লাগেনি। লাগবার কোন কারণও নেই। হাসিখুশি অল্পবয়সী ছাত্রীর দল। একটু গল্প শুনেই কত খুশি। ওদের সঙ্গে মিলে মিশে, সন্ধ্যা রাত্রটুকু ভালই কাটল। আমি তেমন একটা ঘরকুনো বা নির্জনতা বিলাসী মানুষ নই। এক এক সময় তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যখন আমার ভাবনা কবিতার পথে পথে ফেরে। কিন্তু অনেকের মধ্যে থেকেও আমি নিজেকে একলা রাখতে পারি। নিজের মধ্যে থাকতে পারি। জীবিকার ক্ষেত্রে তো আমি বহু কর্মীর সঙ্গী। আমি অনেকের সঙ্গে থাকতে পারি। তবে এই সব ম্যাজিস্ট্রেট বা সরকারি আমলা, ফর্মাল সভা-সমিতিগুলো ঠিক হজম করতে পারি না। বিশেষ করে যেখানে আবার সরকারি আমলার আবির্ভাব ঘটে। এরা নিজেদের পদমর্যাদা সম্পর্কে এত বেশি সচেতন, অনেকটা ভীরু কেউটে সাপের মতই, ফণা তুলে ভীষণ হয়ে থাকে। কেউটে হিংস্র, কেননা কেউটে ভীরু, সে তার নিজের ছায়াকেই শত্রু সন্দেহ করে ছোবল মারে।

আমি সীতা রায়ের দিকে তাকিয়ে বিনীত হেসে বললাম, 'কালকের দুপুরের আসর থেকে আমাকে বাদ দিলে হয় না ?'

জবাব দিল মেয়েরা, 'না না, আমরা ছাড়ব না ; কাল দুপুরে আপনাকে আমাদের সঙ্গে খেতেই হবে।'

মেয়েদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে অধ্যাপিকাদের দিকে তাকালাম। সীতা রায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন অসুবিধে আছে অনীশবাবু ?'

বললাম, 'ফর্মাল কোন সভায় আমি ঠিক সুবিধে করতে পারি না।'

সীতা রায় বললেন, 'সে তো আমাদের সকাল বেলাতেই হয়ে যাবে। ম্যাজিস্ট্রেট আসবেন, ছেলেমেয়েদের অভিবাদন গ্রহণ করবেন, একটু কিছু বলবেন। তারপরে ওঁরও এখানে কিছু অফিসিয়াল কাজকর্ম আছে সে-সব সারতে যাবেন। দুপুরে খেতে আসবেন মেয়েদের ক্যাম্পে। আপনিও সে সময়েই আসবেন, কোন ফর্মাল সভা কিছু নেই।'

এর পরে আর 'না' বলা যায় না। বললাম, 'ঠিক আছে। এখন উঠি।'

সর্বাণী বলে উঠল, 'সমুদ্রে চান সেরে আমরা আপনাকে ডেকে নিয়ে আসব।'

বললাম, 'তার কোন দরকার হবে না। আমি নিজেই চলে আসব।' আরো কয়েকটি মেয়ে বলে উঠল, 'আমরা যাব আপনাকে আনতে।' আমার সঙ্গে অধ্যাপিকার দৃষ্টি বিনিময় হল। সীতা রায় মেয়েদের দিকে ফিরে বললেন, 'আচ্ছা যেও যেও। ওঁর বাড়িটা কোথায় জেনে রাখ।'

আমি বাড়ির নাম আর জায়গা বলে উঠে দাঁড়ালাম। সকলেই আমার সঙ্গে উঠল। এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে টুকুর চোখাচোখি হল। ও তেমনি করেই তাকিয়ে আছে। বহুদূরের আকাশে মেঘ থাকলে যেমন বিদ্যুৎ চমকে ওঠে, আমার মন যেন তেমনি চমকে উঠল। যেন আমার দিবাশেষে ভোরের সূর্যের হাতছানি। এত

দেশদেশান্তর ঘুরে, এত দেখে শেষে চমকে দিচ্ছে কি না একটি সূর্যমুখী বালিকা! এ রকম অপ্রাকৃত আর অবাস্তব আর কী হতে পারে।

আমি নিজেকেই বিদ্রূপ করে হেসে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। সবাই আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। সমুদ্রের কাছাকাছি এসে বাতাসে নোনা জলের গন্ধ পেলাম। এখনো দেখা যাচ্ছে, কেউ কেউ সমুদ্রের ধারে রয়েছে। কয়েকজন চানাচুর আলু-কাবলিওয়ালা, বাজারের সামনে কয়েকটি খাবার আর চায়ের দোকান খোলা। সেদিকে না গিয়ে আমি আমার ফেরার পথে গেলাম। বিকেল বেলা কোনদিনই প্রায় গাড়ি নিয়ে বেরোই না, হেঁটে বেড়াই। ট্যুরিস্ট লজের সামনে দিয়ে যাবার সময় মনে পড়ল টুকুর মা এখানে আছেন। গাড়িপার্কের জায়গায় দু-তিনটে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সামনে উঁচু বাঁধানো বসবার জায়গায় কয়েকজন শোফায় বসে আছে।

বাড়ি এসে দেখলাম নিচের আর ওপরের বারান্দায় আলো জ্বালানো রয়েছে। আমাকে দেখে একজন ভৃত্য এগিয়ে এল। কোন কাজ বলার মত কিছু নেই। দোতালার সিঁড়িতে পা দিতেই আমার শোবার ঘরের আলো জ্বলে উঠল। চাকর মালীদের মধ্যেই কেউ জ্বালিয়ে দিল আমি এসেছি দেখে। ঘরে ঢুকে উজ্জ্বল আলোয় আয়নার দিকে তাকালাম। এগিয়ে গেলাম। রগের পাশে সাদা চুল ক'টা মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম। তারপর আলো নিভিয়ে সমুদ্রের ধারে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে মনে বললাম, একে বলে বিভ্রম। বনের প্রান্তে নিঃশব্দে বসে থাকা অবস্থায় হঠাৎ পাখির ডাক শুনে চমকে ওঠা। চমকে ওঠা মানে, জীবনের সঙ্গে কোথাও যোগ নেই। কোন কারণ নেই, যুক্তি নেই।

বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা ভেসে এল, 'সাহেব আপনাকে খেতে দেব?' বললাম, 'একটু পরে।'

সকাল বেলা আমার ঘুম থেকে উঠতে খুব বেশি দেরি হয় না। শত হলেও কারখানার লোক তো। প্রাতঃকৃত্যাদির পরেই গেঞ্জি গায়ে, শার্ট পরে, যেটা আমার প্রধান কাজ, তা হল কিছু আসন এবং স্কিপিং করা। এসব আমার শরীরকে অনেক হালকা আর সবল রেখেছে। কলকাতায় থাকলে আসন স্কিপিং-এর পরে একটু কফি খেয়ে বিশ্রাম, তারপরে স্নান, প্রাতরাশ, কারখানায় গমন। এখানে কারখানা নেই, সমুদ্রের ধারে বিশ্রামের বিলাসিতাটুকু তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করি। আসন স্কিপিং-এর পরে নিচের বাগানে বসে প্রাতরাশ সেরে নিই। ওরা গাড়িতে তুলে দেয় তোয়ালে পায়জামা আর ড্রেসিং গাউন। ফ্লাস্কে কফি, কাপ ডিস। আমি মনের মত একটি বই সঙ্গে নিয়ে নিই। তারপরে গাড়ি নিয়ে চলে যাই সমুদ্রের ধার দিয়ে মোহনার কাছাকাছি নিরিবিলিতে। ঝাউবনের ছায়া ঘেঁষে, বসে বসে একটু বই পড়ি, আবার কফি খাই, সিগারেট পান করি। তারপরে এক সময়ে জলে নেমে যতক্ষণ খুশি স্নান করে পোশাক বদলে ফিরে আসি।

আজও তাই করলাম। চান করবার জন্য বেরোতে বেরোতে দশটা বেজে গেল। বেড়াতে এসেছি বলেই এত দেরি। কলকাতায় হলে এতক্ষণে আমি কারখানার মেসিন শপের সামনে। গাড়ি নিয়ে সমুদ্রের ধারে নেমে একবার আদিগন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। গতকালের তুলনায় আজ একটু ঠাণ্ডা। আকাশে নেই সাদা মেঘের ভেলা। জেলেরা সুযোগ বুঝে মাছ ধরতে নৌকা ভাসিয়ে দিয়েছে। সৈকত জুড়ে এবং ঢেউয়ের বুকে স্নানার্থীদের যেন উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। হাঁকডাক চিৎকার হাসিতে স[illegible]কত মুখর। বেশ ভাল লাগে দেখতে। কিছু ছেলেরা আবার জলে ফুটবল নামিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলা করছে। কেউ কেউ একটু দূরে চলে গিয়েছে সাঁতার কাটতে কাটতে।

আমি গাড়ি চালিয়ে দিলাম খালের মোহনার দিকে। বিদেশী গাড়ি, একটু বড়, আমার প্রিয়। নিজেই আনিয়েছিলাম। বেশ খানিকটা চলে এসে বাঁদিকে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গায়ে তোয়ালেটা জড়িয়ে নিলাম। বই, কফির ফ্লাস্ক আর সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে খালি পায়ে ঝাউবনের ছায়া ঘেঁসে বসলাম। ঠাণ্ডা বালিতে কনুই ঠেকিয়ে, কাত হয়ে বসতে বড় আরাম। বিদেশীরা হলে এ সময়ে বীয়র পান করত। বিদেশ হলে হয়তো আমিও করতাম। তেমন ভক্ত নই, মাঝে মধ্যে পার্টিতে গেলে একটু-আধটু পান করে থাকি। কোন আসক্তি নেই।

কফি ঢেলে নিয়ে, বই খুলে বসলাম। বইটি একটি য়ুরোপীয় সঙ্গীতকলার ওপর রচিত। য়ুরেশীয় সঙ্গীত সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা আছে। বিশেষ করে স্লাভ জাতিগুলোর গানের সঙ্গে এশিয়ার সুরের যোগাযোগ। প্রথমেই বইয়ের দিকে মন যেতে চায় না। সমুদ্র আর আকাশই দৃষ্টি কেড়ে রাখে খানিকক্ষণ। তারপর বইয়ে মনোনিবেশ করি।

কতক্ষণ নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম খেয়াল করতে পারি না। এক সময়ে আমার একটি ইন্দ্রিয় যেন সচেতন হয়ে উঠল। মনে হল আমার আশেপাশে কেউ রয়েছে। আমি বই থেকে চোখ তুলে সামনে কিছুই দেখতে পেলাম না। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চেয়ে অবাক হলাম। এক গুচ্ছ মেয়ে। আমি ফিরে তাকাতেই ওরা হেসে উঠল। আমি উঠে বসে বললাম, 'আরে, তোমরা কোথা থেকে এলে ?'

এরা গতকালের সেই মেয়ে, এখন দলে বোধ হয় সাত আটজন আছে। তার মধ্যে আমার নাম জানা যাদের তারা সকলেই আছে। সর্বাণী, ঋতা আর টুকু। টুকুর পরিবর্তনের মধ্যে চুল খোলা, মুখটা একটু রোদে ঝলসানো। সকলেরই প্রায় তাই। কিন্তু উজ্জ্বলতর টুকুর মুখ, দৃষ্টিতে সেই অপলক ভাব।

সর্বাণী বলল, 'আমরা চান করবার আগে একটু বেড়িয়ে নিচ্ছিলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম গাড়িটা আর আপনাকে।'

ঋতা বলে উঠল, 'আমরা দূর থেকেই ফিরে যাচ্ছিলাম। আপনাকে চিনতে পারিনি। টুকু আপনাকে চিনতে পেরেছে।'

টুকুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তাই নাকি। তোমার দূরদৃষ্টি তো খুব দেখছি। গায়ে তোয়ালে জড়ানো শর্ট পরা অবস্থাতেও চিনতে পারলে?'

টুকু ঘাড় কাত করে বলল, 'হ্যাঁ। আমি অনেক দূরের জিনিস দেখতে পাই।'

টুকুর কথার মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত আছে? ওর বয়সী একটা মেয়ের কথায় আবার ইঙ্গিত কী থাকতে পারে।

একটি মেয়ে হেসে বলে উঠল, 'টুকু রোজ মৌরলা মাছ খায় কী না, সেজন্য ওর চোখের জ্যোতি বেশি।'

সব মেয়েরা হেসে উঠল। টুকু ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'মোটেই না। চোখের জ্যোতি বাড়ে গুগ্‌লি আর হিঞ্চে শাক খেলে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তাই নাকি? কিন্তু গুগ্‌লিটা কী?'

টুকু বলল, 'এক ধরনের ছোট ছোট শামুক।'

আমার অবাক লাগল, হাসিও পেল। সত্যি, এসব জানি না। সরল ভাবেই জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি খাও বুঝি?'

মেয়েরা আবার সবাই খিলখিল করে হেসে উঠল। টুকু আমার দিকে ওর সেই দূর পারের দৃষ্টি দিয়ে বিদ্ধ করে বলল, 'মোটেই না। আমি ওসব কিছুই খাই না। এমনিতেই আমি সব দেখতে পাই।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে তুমি ওসব জানলে কী করে?'

টুকু বলল, 'বাড়িতে বলাবলি করে শুনেছি।'

আমি হেসে ঘাড় নাড়লাম। এসব কথা শোনবার সুবিধা আমাদের পরিবারে বিশেষ হয়নি। কারণ বোধহয় মা মারা গিয়েছেন বলে। সংসারে গিন্নিবান্নিরা না থাকলে এসব কথা শোনা যায় না। আমি আমার শর্টটা ধরে একটু টানাটানি করছিলাম। মেয়েদের সামনে একটু যেন লজ্জাই বোধ করছি। অবিশ্যি এখন আর কোন

boiRboi.net

উপায় নেই। স্নান না করে পোশাক বদলানো যাবে না। একটা সিগারেট ধরালাম।

সর্বাণী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বুঝি এখানে এসে নির্জনে পড়াশোনা করেন ?'

হেসে বললাম, 'কি আর করি বল। তোমাদের মত তো আর ছুটোছুটি করতে পারি না এখন।'

সর্বাণী বলল, 'আমার খুব ভাল লাগছে। ওটা কী বই পড়ছেন, দেখব ?'

'নিশ্চয়ই।' আমি বইটা এগিয়ে দিলাম। সর্বাণী নিল। মেয়েরা বইটার দিকে ঝুঁকে পড়ল। সর্বাণী গতকাল আমার কবিতা আবৃত্তি করেছিল। সকলের মধ্যে এই মেয়েটির মধ্যে একটু গভীরতা বেশি আছে মনে হয়, সেজন্য কৌতূহলও বেশি। সাধারণ দেখতে, চোখ দুটো ডাগর। সব মেয়েই বইটা দেখছে। কিন্তু টুকু বইটা দেখতে দেখতেও আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। স্পষ্টতই বোঝা যায় বইটার প্রতি ওর তেমন কোন কৌতূহল নেই।

ঋতা বলে উঠল, 'স্যার, আপনি নিশ্চয়ই গান গাইতে জানেন ?'

জবাবটা শোনবার জন্য সব মেয়েরাই তাকাল। বললাম, 'সে গলাটা আমি পাইনি। তাহলে তো কালই তোমাদের গান শুনিয়ে দিতাম।'

আর একটি মেয়ে বলল, 'আপনার "ভারতীয় সঙ্গীতে রাগ ও তার বিকাশ" বইটা আমাদের বাড়িতে আছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি পড়েছ নাকি ?'

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে লজ্জা পেয়ে বলল, 'না, আমি বুঝতে পারি না। আমার দিদির বই। দিদি রবীন্দ্রভারতীর ছাত্রী।'

সর্বাণী বইটা ফিরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কোন্ বই বেরোচ্ছে এখন ?'

বললাম, 'এই মুহূর্তে কিছুই না। তবে বেরোবে।'

তারপরেই ঋতার প্রশ্ন, 'আপনি চান করবেন কখন ?'

বললাম, 'এইবার জলে নামব ভাবছি।'

ঋতা বলে উঠল, 'আমরাও তাহলে এখানে আপনার সঙ্গে চান করব। ওদিকটায় ভীষণ ভিড়।'

বিব্রত আর অস্বস্তি বোধ করলাম। ঘাট ছেড়ে আঘাটায় এসে এতগুলো মেয়ে আমার সঙ্গে স্নান করবে সেটা কি একটু বিসদৃশ দেখাবে না! হেসেই বললাম, 'তোমাদের বন্ধুরা সব ওদিকে রয়েছে। তাদের ছেড়ে এই নিরালায় স্নান করবে কেন?'

সর্বাণী বলল, 'এখানে করব, আবার ওখানে গিয়েও করব।'

সব মেয়েরাই সায় দিল। টুকুর সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হল। ও বলে উঠল, 'আমার আবার ফাঁকা জায়গায় স্নান করতে ভয় লাগে, মনে হয় হাঙর আসবে।' আমি বললাম, 'সেই জন্যেই তো বলছি, তোমরা সকলের সঙ্গে গিয়ে চান কর।'

মেয়েরা সবাই ঘাড় নেড়ে দিল। সর্বাণী বলল, 'না না, এখানেই করব। ফাঁকা আবার কোথায় দেখলি টুকু, আমরা তো এতগুলো মেয়ে রয়েছি।'

আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা আপনার সঙ্গে চান করব চলুন।'

খানিকটা আবদারের ভঙ্গিতে বলল। সকলেরই তাই। সহজ আর আনায়াস। অসম্ভব আর কী, সহজ মনে বলতেই পারে। আমি ওদের দিকে একবার স্নেহের চোখে তাকিয়ে হেসে বললাম, 'চল তাহলে।'

টুকু বলে উঠল, 'সর্বাণী, আমি কিন্তু তোর হাত ধরে থাকব।'

সর্বাণী বলল, 'ইস্, আর আমি বুঝি ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকব? সাঁতার কাটব না?'

একটি মেয়ে বলল, 'টুকু, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের সাঁতার কাটা দেখ।'

আমি টুকুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি বুঝি সাঁতার জানো না?'

টুকু কথা না বলে ঘাড় নাড়ল, জানে না। আরো কয়েকটি

মেয়ে বলল, তারাও জানে না। আমি তাদের বললাম, 'তাহলে বেশি দূরে যেও না।'

গা থেকে তোয়ালেটা খুলে নিয়ে গাড়ির মাডগার্ডের ওপর রাখলাম। গেঞ্জিটা খুলে ফেললাম, খুলেই টুকুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হয়ে গেল। টুকু আমার খোলা গায়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আবার মুখের দিকে তাকাল। আমি জলের দিকে এগিয়ে গেলাম। ওরা সব আমাকে ঘিরে চলল। জলে নেমেই কেউ কেউ বসে পড়ল। ঢেউয়ের আঘাতে ছিটকে পড়ল। হৈ হুল্লোড় হাসি শুরু হয়ে গেল। সব মেয়েরাই শাড়ি জামা পরে আছে। কয়েকটি মেয়ে বেশ ভাল ভাবেই ঢেউ খেতে লাগল, ওরা নিশ্চয় সাঁতার জানে। ওদের জল ছিটকানো হৈচৈ দাপাদাপি বেশ ভাল লাগল। আমিও হাসতে হাসতে হাঁটু জলে গিয়ে দাঁড়ালাম। মেয়েরা সবাই আমাকে একবার তাকিয়ে দেখল, সর্বাণী জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি অনেক দূরে যাবেন?'

বললাম, 'হয়তো একটু যাব, কিন্তু তোমরা বেশি দূরে যেও না।' আমি পা বাড়াবার আগেই হঠাৎ কেউ আমার একটা হাত দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। আমি চমকে ফিরে তাকাতেই দেখি, টুকু পিছন থেকে এসে আমার ডানা চেপে ধরেছে। শুধু কি চমকালাম, না আমার ভিতরে সহসা একটা ভয়ংকর নাড়া খেয়ে গেল। আমার বুকের মধ্যে যেন আচমকা দ্রুত তালে দুরু দুরু করে উঠল। টুকু প্রায় আমার গায়ের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। চেয়ে দেখছে আমার চোখের দিকে। একটু ভীরু আদুরে স্বরে বলল, 'আমি একলা নাইতে পারব না। আপনার সঙ্গে নাইব।'

আমি নিজেকে স্থির করে হেসে বললাম, 'পারবে না কেন। দেখ না, তোমার সব বন্ধুরাই তো কেমন চান করছে।'

টুকু ওর মুখ প্রায় আমার ডানার কাছে ঘষে, মাথা নেড়ে বলল, 'না না, ওরা আমাকে ডুবিয়ে দেবে। আপনাকে ধরে আমি একটুখানি চান করেই পাড়ে উঠে যাব। আপনি আমাকে ছেড়ে দেবেন না তো?'

বলতে বলতে টুকু আমার দিকে মুখ তুলে ধরল। ওর সেই চোখের তারা দুটির দিকে আমার চোখ পড়ল। আমার এতদিনের নিথর রক্ত কি কেঁপে উঠল? দূর থেকে বুঝতে পারিনি, ও বেশ লম্বা। আমি হাসলাম, একটা অসহায় অবস্থার মধ্যেও মনে হল আমাকে যেন কোন তীব্র স্রোতধারা টেনে নিয়ে চলেছে, যে ধারাটা টুকুর দু'হাতের আকর্ষণে, ঠোঁটের এই মুহূর্তে ভীরু অথচ খুশির হাসিতে, দূর পারের চোখের ঝিলিকে এবং স্পর্শে রয়েছে।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই অন্যান্য মেয়েদের চোখ পড়ে গিয়েছে এদিকে। ওরা সবাই চিৎকার করে উঠল, 'এই টুকু, আমাদের সঙ্গে আয়।'

টুকু আরো জোরে আমাকে আঁকড়ে ধরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'না না।'

টুকুর 'না না' শুনেই অন্য মেয়েরা যেন আরো বেশি উৎসাহিত হয়ে উঠল। ওরা নিজেদের মধ্যে একটা খেলা পেয়ে গেল। কয়েকটি মেয়ে ভেজা গায়ে ছুটে এসে টুকুকে আঁকড়ে ধরল। টুকু ভয় পেয়ে এবার আমাকে দু'হাতে সবলে জড়িয়ে ধরল। প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'না না, আমি যাব না।'

আমি যেন শক্ত হয়ে উঠলাম। সারা জীবনে অপরিচিত একটা স্পর্শে, এই অকূল সমুদ্রের জলে দাঁড়িয়ে আমি যেন অন্য কোন এক অকূলে ভেসে যেতে লাগলাম। তথাপি আমার হাসি পেল। টুকুর কোন খেয়ালই নেই, ও জোর করে আমার বুকে মুখ গুঁজে দিয়েছে, খোলা চুল ছড়ানো আমার গায়ে।

অন্য মেয়েরা কিছুতেই ছাড়বে না। ওরা হেসে চিৎকার করে টুকুকে আমার শরীর থেকে ছাড়িয়ে নিল। এখন খেলাটা ওদের নিজেদের মধ্যে। আমার কিছু বলবার নেই। হাঁটু জলের ওপরেই ওরা সবাই মিলে টুকুকে নিয়ে পড়ল। কয়েকটি মেয়ে এই ধস্তাধস্তির মধ্যে নেই। তাদের মধ্যে সর্বাণী রয়েছে। ও একটু দূরে থেকে দেখছে আর হাসছে।

টুকু সমানে চিৎকার করে চলেছে। মেয়েরা ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। দুটি মেয়েকে দু'হাতে টুকু আঁকড়ে ধরে রয়েছে। সত্যি দেখছি, মেয়েটি জলকে ভয় পায়। মিনিট দুয়েক পরে, আলুথালু ভেজা কাপড়ে, মুখ ঢাকা চুলে, সারা গায়ে জলে বালিতে মেখে পাড়ের দিকে ছুট দিল। কয়েকটি মেয়ে ওকে তাড়া করল। টুকু মরিয়া হয়ে ছুটল এবং অনেকখানি গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল। পিছন থেকে মেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠল।

আমিও হাসছিলাম। কিন্তু জামা-কাপড় পরে থাকা অবস্থায় শরীরের ভিতরে কোন পোকা-পতঙ্গ নড়ে চড়ে বেড়ালে যে রকম হয় আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে যেন সে রকম একটা অনুভূতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছুই না, অল্পবয়সী এবং সমবয়সী মেয়েদের একটা খেলা। তার মধ্যে একজনের খেলাটাই কেমন আমার অচেনা অনুভূতির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে গেল। নিজের কাছে নিজেরই সংকোচ এবং লজ্জা, এবং আমি অনীশ মিত্র, বয়সের হিসাবে আমাদের দেশে যাকে প্রায় প্রৌঢ় বলা চলে, ভেবে ধিক্কার দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই। আমার মধ্যে কি বিকারের লক্ষণ দেখা দিয়েছে? এত দিন ধরে যে জীবনকে আমি সুস্থ স্বাভাবিক মনে করে এসেছি সেটা কি একটা ভ্রান্তি মাত্র? বিশ্বাস করতে পারি না।

জীবন নিষ্ঠা কী। বাতিকগ্রস্তের মত সে-কথা আমি কোনদিন মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসিনি। কাজ এবং সৃষ্টি এবং মননশীলতার মধ্যে আমি বরাবর সুস্থ শরীর নিয়ে জীবনযাপন করে এসেছি। বিয়ে করিনি বা প্রেম ঘটল না, তা নিয়ে বন্ধুরা অনেকে হাসি-ঠাট্টা করেছে। আমি তো হেসেই তা উপভোগ করছি। কিন্তু নিজেকে বুঝতে আমার ভুল হয়নি।

তবে আজ এটা কী। আমাকে কি নিজেকে নিয়ে সেই মধ্যবয়সের পুরুষের টিপিক্যাল বিকৃত মনের গল্প ভাবতে হবে? অসম্ভব! আমি নিজেকেই যেন ঝাঁকিয়ে তুলে জলের দিকে এগিয়ে গেলাম। কেবল একটি কথাই মনে হল, টুকু না হলে বোধ হয় এরকম একটা অবস্থা

ঠিক হত না। গতকাল প্রথম থেকেই কোথায় যেন কি একটা ঘটে গিয়েছে, সহসাই যেন একটা কিছু বিদ্ধ করে রেখেছে আমাকে। কী বিঁধেছে আমাকে? টুকুর চোখ অথবা ওর সেই চোখ থেকেই কিছু!

কিন্তু এসব আমি বিশ্বাস করতে পারি না। বিশ্বাস করার কোন যুক্তি নেই। আমি ক্রমে গভীর জলে গিয়ে পড়লাম। পিছন থেকে চিৎকার শুনতে পেলাম, আর যাবেন না, আর যাবেন না।

পিছন ফিরে দেখলাম, ওরা অনেকে হাত তুলে আছে আমার দিকে। আমি হাত তুলে নাড়ালাম। এখন আমি শক্ত মাটির নাগাল পাচ্ছি। কিন্তু যেখানে এসে পড়েছি সেখানে ঢেউ ভাঙে না। ঢেউ আসে ঢেউয়ের পরে। মাঝে মাঝে পা মাটিতে ঠেকতে পাচ্ছে না। অনেক সময় এ রকম সীমানাটা ঠিক নির্ভয়ের নয়, তলার স্রোত দূরে টেনে নিয়ে যেতে পারে। তবে দীঘার সমুদ্রের সঙ্গে আমার বেশ কয়েক বছরের পরিচয় আছে। সেইটাই যা ভরসা। আমি প্রায় এ রকম দূরত্বে এসেই সাঁতার কাটি। এ রকম ঢেউয়ের পরে ঢেউয়ে ভাসাতেই সমুদ্র স্নানের সত্যিকারের স্বাদ পাওয়া যায়। সব থেকে ভাল লাগে, ঢেউয়ের বুকে ডুব দিয়ে চোখ চেয়ে থাকলে অজস্র রুপোলী ছোট ছোট মাছ মাথার ওপর দিয়ে চলে যায়। ঠিক যেন ঝাঁকে ঝাঁকে রুপোর অজস্র তীর ছুটে আসে আবার নিচে দিয়ে চলে যায়।

কোন দিকে না ফিরে অনেকক্ষণ ধরে একলা একলা ঢেউয়ে দোল খেলাম। এক সময়ে পিছন ফিরে দেখলাম মেয়েরা সবাই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। ওদের দাঁড়ানোর ভাব দেখে মনে হল ওরা যেন ঠিক নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে নেই। আমি এবার তীরগামী ঢেউয়ের গায়ে গায়ে পাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। অনেকটা ওদের কাছাকাছি আসতে সর্বাণী চিৎকার করে বলল, 'আমরা আপনার জন্য খুব ভয় পাচ্ছিলাম।'

হেসে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

সর্বাণী বলল, 'আমরা ভেবেছি আপনি আসতে পারছেন না।

আপনাকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

ওদের সরল মনের ভীতি দেখে আমি হেসে বললাম, 'না, সেরকম কিছু না। আমি রোজই ওখানে চলে যাই।'

টুকুকে দেখলাম, ও একটা পাগলের মত পাড়ের ওপর বসে আছে। জলের ধারে কাছে নেই। কিন্তু আমার মন এখন বেশ সুস্থ। আমার ভিতরে কোন গ্লানি নেই। বুঝতে পারছি ক্ষণিকের ওই সব অনুভূতিগুলো কিছু না। অনভ্যাসের চমক মাত্র।

আমি ওদের জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা এখনও যাওনি?'

সর্বাণী বলল, 'এবার যাব। আপনি আসছিলেন না বলে আমরা যেতে পারছিলাম না।'

ওরা সবাই দৌড়াদৌড়ি করে পাড়ে উঠে গেল। টুকু ওদের দৌড়তে দেখে আগেই ছুটতে আরম্ভ করল। মেয়েরা মজা পেয়ে টুকুকে তাড়া করে ছুটল। আমি আরো খানিকক্ষণ স্নান করে ওপরে উঠে এলাম। গা মাথা মুছে পোশাক বদলে গাড়ি চালিয়ে ফিরলাম।

•

বাগানের পাশে গাড়ি পার্ক করে নেমেই দেখি নিচের তলার বারান্দায় রীতিমত ভিড়। আট দশটি ছেলে, সতেরো আঠারো বছর বয়স। তাদের সঙ্গে দুজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক, শার্ট ট্রাউজার পরা। একজনের চোখে চশমা। কেউই আমার পরিচিত নয়। একজন ভৃত্য দেখলাম কাছেই দাঁড়িয়েছিল, আমাকে নামতে দেখে সে গাড়ি থেকে ভেজা শর্ট ফ্লাস্ক ইত্যাদি নামিয়ে নিতে এল। আমি বারান্দার দিকে এগোতে সমস্ত দলটা আমার দিকে এগিয়ে এল। সকলের মুখেই একটু হাসি। চশমা পরা যুবক ভদ্রলোকটি কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল, আমিও করলাম।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন, তিনি একজন অধ্যাপক, কলকাতা ইণ্টার-কলেজ ক্যাম্পে ছেলেদের নিয়ে এসেছেন। তাঁর সহযোগী অধ্যাপকের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে ছেলেরা হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার পায়ের ধুলো নিতে আরম্ভ করেছে। আমি ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওদের বাধা দিতে চাইলাম। কিন্তু শুনল না। তারপরে ওদের বক্তব্য যা শুনলাম, অস্বস্তি বোধ করলেও না হেসে পারলাম না। আমি যে গতকাল সন্ধেয় মেয়েদের ক্যাম্পে গিয়েছিলাম এবং দারুণ গল্প করেছি এবং আজ আবার দুপুরে ওদের কাম্পে নিমন্ত্রিত হয়েছি, এসব ওরা একতরফা হতে দেবে না কবি অনীশ মিত্রকে ওরাও চায়। আজ সন্ধেয় ওদের কাম্পে যেতে হবে এবং রাত্রে ওদের সঙ্গে খেতে হবে।

আমি হাসতে হাসতে অনেক ভাবে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম, গতকালের ব্যাপারটা নিতান্ত ঘটনাচক্রে ঘটে গিয়েছে, আমি এসবে মোটেই অভ্যস্ত নই। কিন্তু ওরা শোনবার পাত্র না, অধ্যাপক দুজনও নাছোড়বান্দা। তাঁদের এক কথা, আপনাকে কাছে পেয়ে ছেড়ে দিতে পারি না। ছেলেদের আবদার আর একটু অন্য-রকম। মেয়েদের ক্যাম্পে যখন গেছেন তখন আমাদের ক্যাম্পে যেতেই হবে। যেন তা না হলে ছেলেদের ক্যাম্পের ইজ্জত চলে যাবে। এখন ব্যাপারটা প্রায় সেই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ভাল বিপদে পড়া গিয়েছে।

একটি ছেলে বলে উঠল, 'ভূতের গল্পটা আমাদের শোনাতে হবে।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'ভূতের গল্পের খবরও জানা হয়ে গেছে?'

একজন অধ্যাপক বললেন, 'বোধহয় গোটা দীঘার লোকই এখন জানে। শুধু ছাত্রীরা নয় অনীশবাবু, একজন মহিলা অধ্যাপিকা কাল রাত্রে শুয়ে ঘুমোতে পারেননি। কেবল আপনার গল্পের কথা নাকি মনে পড়েছে।'

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। বুঝতে পারলাম, এই ক্ষাপা ছেলেদের বিমুখ করা সম্ভব নয়। রাজী হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে,

boiRboi.net

আজ সন্ধেয় তোমাদের ক্যাম্পে যাব।'

ওরা খুব খুশি হয়ে হেসে বকবক করতে করতে অধ্যাপকদের সঙ্গে বেরিয়ে চলে গেল। আশ্চর্য, কোথা থেকে কী ঘটে গেল। এতকাল দীঘায় আসছি, এ রকম ঘটনা কখনো ঘটেনি। এবার একটু তুনত্ব হল, মন্দ কী। ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে একটু অনিয়ম, খানিকটা বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দিল। জীবনেরও এটাই নিয়ম, সে ছকে বাঁধা নয়।

আমি সোজা দোতলায় উঠে বাথরুমে চলে গেলাম। সেখানে আলাদা তোয়ালে সাবান শ্যাম্পু সবই রয়েছে। জামাকাপড় ছেড়ে, ঝর্ণার মুখ খুলে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে মিষ্টি জলে স্নান করলাম।

সমুদ্রে স্নানের পর শরীরে যেন একটি মধুর ক্লান্তি নেমে আসে। বই পড়তে পড়তে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একটু চোখ বুজে এসেছিল। বইটা পড়েছিল আমার কোলের কাছে। হঠাৎ কী একটা শব্দে আমার তন্দ্রা ভেঙে গেল। আমি চোখ মেলে তাকালাম। কিন্তু কারোকে দেখতে পেলাম না। অথচ আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছে, অমি একা নেই, আমার আশেপাশে কেউ আছে। বাড়ির কোন ভৃত্য কি কোন দরকারে এঘরে এসেছিল, বা এখনো পাশের ঘরে বা বারান্দায় রয়েছে?

হঠাৎ বারান্দায় যেন পায়ের তুপদাপ শব্দ পাওয়া গেল এবং দরজার সামনে পর্দাটা তুলে উঠল। চকিতেই যেন একটি ছায়া সরে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে ওখানে?'

কোন জবাব পাওয়া গেল না। অবাক হলাম, চাকর-বাকর এরকম নিরুত্তর থাকতে পারে না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'বাইরে কে?'

এবার আস্তে আস্তে পর্দা সরল। তারপরে একটি একটি করে মুখ উঁকি দিল। সর্বানী ঋতা টুকু পর পর পাঁচ ছ'জন। সকলের মুখেই একটু বিব্রত সংকোচের হাসি। আমি হেসে বললাম, 'ও, ঠিক তুপুর বেলা, ভুত মারে ঠেলা।'

সর্বাণী বলে উঠল, 'আমরা ভূত নই, সব পেতনী। আপনি খুব রাগ করেছেন তো আমাদের ওপর?'

'কেন?'

'আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।'

'এটা কি ঘুমোবার সময় নাকি? এমনি একটু চোখ বুজে এসেছিল।'

সর্বাণী বলল, 'আমরা চাকরদের কিছু না বলে সোজা ওপরে চলে এসেছি। এমন চুপদাপ করে এসেছি, এসেই দেখি আপনি চোখ বুজে ঘুমোচ্ছেন। আপনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি ভেবে ভয় লাগছিল।'

আমি অভয় হেসে বললাম, 'কোন ভয় নেই তোমাদের, আমি ঠিক ঘুমোচ্ছিলাম না। তা তোমাদের কী ব্যাপার বল।'

এবার টুকু বলে উঠল, 'বা রে, ব্যাপার আবার কি! খেতে যাবেন না?'

সর্বাণী বলল, 'আপনাকে আমরা নিতে আসব বলেছিলাম।'

তাওতো বটে। ভুলে যাইনি ঠিকই, এতটা খেয়াল ছিল না। বললাম, 'নিশ্চয় খেতে যাব। আমার জন্য এখানে আজ রান্না হয়নি। না গেলে যে উপোস করে থাকতে হবে।'

টুকু ওর ডান হাতটা তুলে কবজি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল। বলল, 'দেখুন। ক'ট বেজেছে। তাড়াতাড়ি চলুন।'

চওড়া কালো ব্যাণ্ডের ওপরে ওর ঘড়ির কাঁটায় দেখলাম একটা বেজে পনের মিনিট হয়েছে। টুকুকে এখন একটু অন্যরকম লাগছে। সেই নিষ্পলক চোখে বিদ্ধ করার ভাবটা ঠিক নেই। ঠোঁটের কোণে যে একটা রহস্যের হাসি লেগেছিল, সেটা এখন অনেকটা স্বাভাবিক। আমি যেন একটু স্বস্তিবোধ করলাম, ওকে এখন সকলের সঙ্গে মেশানো যাচ্ছে। আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'ও, খুব খিদে পেয়েছে বুঝি?'

টুকু ওর লাল ঠোঁট উল্‌টে বলল, 'মোটেই না।'

সর্বাণী বলল, 'আমি মিছে বলব না, আমার খুব খিদে পেয়েছে।'

আমি বললাম 'আমারো।'

মেয়েরা সবাই হেসে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তা তোমাদের যে কী সব অনুষ্ঠান ছিল এ বেলা। সে সব মিটে গেছে?'

[illegible]লল, 'সে তো কখন, সেই সকালবেলা, স্নান করতে যাবার [illegible]ই। ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার রায় তো এসেছেন সকাল আটটায়।'

সর্বাণী বলল, 'তাঁর সঙ্গে এসেছে আর্মড পুলিশ, গোটা একটা দফতর। উর্দি পরা বেয়ারা আর আমলাদের ছুটোছুটি দেখে আমরাই হকচকিয়ে গেছি।'

সর্বাণী মেয়েটি বুদ্ধিমতী। ম্যাজিস্ট্রেটকে বিদ্রূপ করছে কী না ঠিক বোঝা গেল না। তবে সরকারি সমারোহ যে ওর ভাল লাগেনি সেটা বোঝা গেল।

ঋতা বলল, 'কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোক খুব ভাল। মুখ গোমড়া না, হেসে হেসে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আপনার নাম শুনে খুব খুশি হলেন, বললেন, এ তো খুবই সৌভাগ্যের কথা, ওঁর সঙ্গ পাওয়া যাবে।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'তাই নাকি?'

টুকু যেন খানিকটা আবদার এবং দাবীর ভঙ্গিতে বলল, 'চলুন না।'

সর্বাণী বলল, 'ও কি রে টুকু, দাঁড়া, উনি জামাকপড় বদলাবেন তো।'

এই মুহূর্তে টুকুর চোখের তারা যেন আবার সেই রকম অপলক স্থির হয়ে গেল। হঠাৎ ঠোঁট টিপে ভুরু কুঁচকে আমাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। মনে হচ্ছে ও যেন আমার অনেক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, পরিচয়টা অনেক দিনের। আমি হেসে বললাম, 'আহা, ওকে ও রকম করে বল না সর্বাণী, বেচারির বড্ড খিদে পেয়েছে।'

টুকু চোখের কোণে আমাকে দেখে বলল, 'ইস। আমি একবেলা না খেয়েও থাকতে পারি।'

সর্বাণী বলল, 'আমরা সবাই পারি।'

আমি হেসে বললাম, 'তোমরা আমাকে একটু ফেভার কর। তু'

মিনিট বাগানে গিয়ে থাক, আমি জামাকাপড় বদলে আসছি।'

সঙ্গে সঙ্গেই ওরা নেমে গেল। আমি পায়জামা পাঞ্জাবি ছেড়ে শার্ট আর ট্রাউজার পরে নিলাম। চুলটা আঁচড়ে নিয়ে নিচে এসে দেখি, ওরা জুঁই ফুল গাছের ঝাড়ের কাছে ছুটোছুটি করছে। দুটো প্রজাপতি উড়ছে, তাদেরই ধরবার চেষ্টায়। টুকু আবার আঁচলের ঝাপটা দিচ্ছে। একটি চকিত মুহূর্ত মাত্র, টুকুর শরীরের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল। পরমুহূর্তেই আমি হেসে বললাম, 'সকালবেলায় প্রথম রোদে অনেক বেশী প্রজাপতি ওড়ে, তখন ধর। এখন চল যাই।'

ওরা লজ্জা পেয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এল। ওরা নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। কেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। গেটের দিকে এগোতে এগোতে বললাম, 'হেঁটেই যাওয়া যাক, কী বল।'

ঋতা বলল, 'না, আপনার গাড়িতে যাব।

টুকু সায় দিল, 'হ্যাঁ, গাড়িতে যাব।'

আমি এদের নিয়ে গাড়ির কাছে এগোলাম। টুকু আগেই দরজা খুলে সামনের সীটে বসে পড়ল। ঋতাও ওর পাশে বসল। বাকী তিনজন পিছনে। আমার এ গাড়ি অনেক বড়। প্রয়োজন হলে ওদের মত দশজন অনায়াসে চাপতে পারে। আমি গাড়ি স্টার্ট করতে করতে বললাম, 'তোমরা কি কেউ গাড়ি চালাতে পারো?'

ঋতা বলল, 'আমি পারি। দেবেন চালাতে?'

বললাম, 'হ্যাঁ, তারপর অ্যাকসিডেণ্ট কর, তোমাদের প্রফেসররা আমাকে জেলে পুরে দিক।'

ঋতা বলল, 'ইস্। আমি চৌরঙ্গির রাস্তায় গাড়ি চালিয়েছি।'

'কিন্তু শ্যামবাজারে বাগবাজারে তো চালাওনি। চৌরঙ্গির মত চওড়া রাস্তায় সবাই চালাতে পারে।'

'দেখুন না আমাকে চালাতে দিয়ে, আমি ঠিক নিয়ে যাব।'

টুকু বলল, 'না না, তেকে চালাতে হবে না। তারপর আমরা

boiRboi.net

মরি আর কি !'

আমি পাশে তাকিয়ে টুকুকে দেখলাম। সমুদ্র স্নানের পরে মাথায় নিশ্চয় শ্যাম্পু করেছে। মুখের দু'পাশের খোলা চুল, ঘাড়ের কাছে ছড়িয়ে আছে। গোলাপী রঙের শাড়ি আর জামা পড়েছে। পাশ ফিরে তাকাতে দেখলাম ও আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বুঝি খুব মরবার ভয় ?'

টুকু বলল, 'মরবার ভয় আবার কার নাই ?'

সর্বাণী পিছন থেকে বলল, 'তুই তো তখন সমুদ্রে নেমেও মরবার ভয় করছিলি।'

আমি টুকুর দিকে দেখলাম। টুকু লজ্জা পেয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসল আমরা ক্যাম্পে এসে পৌঁছে গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জীপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। অদূরেই একটি কাজু বাদাম গাছের ছায়ায় সশস্ত্র পুলিশের আর একটি জীপ। সীতা রায় এবং তাঁর সহযোগীরা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খেতে এসে গেছেন। আপনার জন্যই অপেক্ষা।'

আমি সীতা রায়ের সাথে একটি ঘরে গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সেই ঘরেই বসে ছিলেন। সীতা রায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। বয়স বেশি না, বোধ হয় আমার থেকেও ছোট ব্যবহারও আমলা সুলভ না, অমায়িক। ঋতার কথাই ঠিক। বললেন, 'মেয়েরা তো আপনার কথায় একেবারে পঞ্চমুখ। কী নাকি গল্প বলেছেন, ওরা মুগ্ধ।'

আমি হেসে বললাম, 'ছেলেমানুষদের একটু ভুলিয়ে রাখ।'

সীতা রায় বললেন, 'ছেলেরা গিয়ে নাকি হামলা করেছে ?'

বললাম, 'ওরাও ছাড়বে না। ও বেলাটা কবুল করিয়ে নিয়েছে।'

সীতা রায় বললেন, 'আপনার দেখছি শাস্তি হয়ে গেল।'

'শাস্তি আর কী। আমাকে পেয়ে যদি ওরা খুশি হয় আমিও খুশি।

ম্যাজিস্ট্রেট ঘাড় নেড়ে বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি আপনার চাকরির খ্যাতি, কবি খ্যাতি সবই জানি। আমাকে আপনার ভক্ত বলতে পারেন।'

আমি হেসে বললাম, 'না না, ভক্ত আবার কী। আপনি কবিতা পড়েন?'

'পড়ি মানে, গল্প উপন্যাসের থেকে আমি কবিতাই বেশী পড়ি। বিশেষ করে অনীশ মিত্র আমার বিশেষ প্রিয় কবি। এক সময় কবি হবার বাসনাও ছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখলাম, সকলের দ্বারা সব কিছু হয় না।'

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে ভদ্রলোক আমাকে মেদিনীপুরে, ওঁর বাঙলোতে নিমন্ত্রণ জানালেন। তার পরেই খাবার ডাক পড়ল। মেয়েরা অনেকেই দাঁড়িয়েছিল। আমরা গিয়ে বসতে অধ্যাপিকাদের সঙ্গে মেয়েরা বসল। সর্বাণী টুকুদের দলটা গাছকোমর বেঁধে তৈরি, ওরা পরিবেশন করবে। দু' তিনজন লোক বড় বড় হাঁড়ি কড়ায় রান্না জিনিসপত্র সব এনে দিল। আমি সর্বাণীর দিকে চেয়ে বললাম, 'এ রকম কথা তো ছিল না। একসঙ্গে খাবার কথা ছিল।'

সর্বাণী বলল, 'আপনাদের খাইয়ে আমরা খাব।'

টুকু বলে উঠল, 'তখন কিন্তু চলে যাবেন না।'

বললাম, 'না না, তোমাদের খাওয়া দেখে তারপর যাব।'

হেসে গল্প করে খাওয়া চলল। টুকু কোথা থেকে আলাদা পাত্রে দুটো বড় বড় রুইয়ের মুড়ো এনে আমার আর ম্যাজিস্ট্রেটের পাতে তুলে দিল। আমি হা হা করে উঠেও বাধা দিতে পারলাম না। টুকু বেশ দাবীর স্বরে বলল, 'খেতে হবে।'

মিঃ রায় আমার দিকে হেসে বললেন, 'ওদের দাবী মানতে হবে।'

কয়েকটি মেয়ে একসঙ্গে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, মানতে হবে।'

বললাম, 'না পারলেও? আমি যে সত্যি মুড়ো খেতে জানি না।'

টুকু বলে উঠল, 'ছেলেরা মুড়ো খেতে জানে [illegible] তা মেয়েরা জানে বুঝি?'

সীতা রায় হেসেই একটু ধমকের সুরে বললেন, 'এই টুকু, ওভাবে কথা বল না। আমার দিকে ফিরে বললেন, আপনি যা পারেন খান, দিয়ে ফেলেছে যখন।'

অগত্যা, যদিও জানি মুণ্ডু চিবিয়ে খাওয়া সত্যি আমার পক্ষে সম্ভব না। মুড়ো চিবিয়ে খাওয়া আমার কাছে রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার। আমার বাবা তার বাঁধানো দাঁতে এখনো বেশ মুড়ো চিবোতে পারেন, আমরা দু'ভাই তাকিয়ে দেখি। বাবা হেসে বলেন, 'এরকম একটি উপাদেয় স্বাদ তোরা কোনদিন জানলি না।'

সর্বাণী টুকু ঋতারা রীতিমত ঘেমে উঠল পরিবেশন করতে গিয়ে। কিন্তু বেশ ভালভাবেই সবাইকে খাওয়াল। আমাদের খাওয়ার পরে আমি আর মিঃ রায় সিগারেট খেতে খেতে ওদের খাওয়াও দেখলাম। অন্য দুটি মেয়ে ওদের পরিবেশন করল। আমি তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুড়ো নেই? টুকুকে একটা দাও।'

মেয়েরা সবাই হেসে উঠল। টুকু বলল, 'আর মুড়ো নেই। আমি কেন মুড়ো খেতে যাব? ল্যাজা খায় রাজা, মুড়ো খায় বুড়ো।'

সর্বাণী কনুই দিয়ে টুকুকে ধাক্কা মেরে বলল, 'কী বোকার মত কথা বলছিস?'

টুকু আমার চোখের দিকে চেয়ে হাসল। আমি মিঃ রায়ের দিকে চেয়ে হেসে ওদের দিকে ফিরে বললাম, 'আমরা তো বুড়োই।'

মিঃ রায় বললেন, 'নিশ্চয়ই।'

ওদের খাবার পরে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। বেলা চারটে বাজতেই ছেলেরা চলে এল। ছেলেদের ক্যাম্পেও একটু সময়ের জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি ছুটি পেলাম রাত্রি প্রায় দশটায়। ওদেরও গল্প শোনাতে হয়েছে। তবে অন্য ধরনের গল্প বলেছি। দীঘায় বেড়াতে এসে একটা দিন কেটে গেল একেবারে অন্য ভাবে। আগামীকাল দুপুরের খাওয়া মিটিয়ে ক্যাম্প গুটিয়ে ছেলেমেয়েরা কলকাতায় ফিরে যাবে।

পরের দিন সকালবেলা যথানিয়মে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আসন স্কিপিং করে, প্রাতরাশ খেয়ে, গাড়ি নিয়ে সমুদ্রে স্নান করতে বেরোব, একপাল বর্ণবাহার হরিণীর মত ছ'টি মেয়ে ছুটে এসে বাগানে ঢুকল। দেখলাম টুকু সর্বাণীর দল, যারা গতকাল দুপুরে এসেছিল। সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'আমরা প্রজাপতি ধরতে এসেছি।'

পাগল আর কাকে বলে। বললাম, তাই নাকি। দেখ কোথায় প্রজাপতি আছে। ওরা সবাই বাগানে ছড়িয়ে পড়ল। সত্যি সত্যি প্রজাপতি উড়ছিল।

দুটো রঙীন প্রজাপতি, বেশ বড়, পাশাপাশি উড়ছে। পাশাপাশি ঠিক বলা যায় না, ওরা যেন পরস্পরকে ধরবার জন্য উড়ে বেড়াচ্ছে। ছ'জনেই সেই দুটোর পিছনে দৌড় ঝাঁপ শুরু করল। প্রজাপতির তুলনায় ফড়িং-এর ভিড় বেশি। ভৃত্যেরা একবার উঁকি দিয়ে দেখে যে যার কাজে চলে গেল। আমি ওদের দৌড় ঝাঁপ দেখতে লাগলাম কিন্তু প্রজাপতি দুটো বেশ সেয়ানা, খালি হাতে ধরতে পারা খুবই কঠিন। অথচ প্রজাপতি দুটো দূরেও পালিয়ে যাচ্ছে না, ওদেরই আশেপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে, যেন খেলা জুড়ে দিয়েছে।

টুকু আজও ওর আঁচল তুলে নিয়েছে। আজও ওর দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল। বুকের কাছ থেকে সমস্ত আঁচলটা তুলে নিয়ে বাঁ-হাতটা বুকের ওপর চেপে ধরে রেখেছে আর ডান হাতে আঁচল দিয়ে প্রজাপতির গায়ে ঝাপটা মারার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। 'এই আমাকে ধাক্কা মারিস না।' কিন্তু গায়ে গায়ে ধাক্কা না লেগে কোন উপায় নেই। ছেলেমানুষের খেলা ছাড়া আর কিছুই না। আমি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালাম। আমার সময় হয়ে যাচ্ছে, ওদের রেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ উল্লেসিত চিৎকার শুনে ফিরে তাকালাম। দেখলাম, টুকু

টুকুর সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। ওর রক্তাভ ঠোঁটে ধনুকের বক্রতা। ওর চোখের তারায় ঝিলিক, তবু যেন একটা সুদূরের ছায়া। সে ছায়ার মধ্যে যেন কী এক রহস্যের ইশারা, যা আমি প্রথম থেকেই দেখতে পেয়েছি। বলল, 'তবু একটা কাকের পেট তা-ই না, বলুন?' বলে আমার দিকে তাকাল।

আমি হেসে ঘাড় নাড়লাম। প্রসঙ্গটা বদলাতে চাইলাম। বললাম, 'তোমরা সবাই খুব হাঁপিয়ে গেছ। একটু কিছু খাও।'

সবাই বলে উঠল, 'না না, আমরা কিছু খাব না।'

সর্বাণী বলল, 'আমরা আজ দুপুরে চলে যাব, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, প্রজাপতি ধরতে আসিনি।'

ঋতা বলে উঠল, 'টুকু কিন্তু তাই এসেছিল।'

ওরা টুকুর দিকে দেখে আমার দিকে চেয়ে হাসল। ঋতার এই কথার মধ্যে কি কোন ইঙ্গিত আছে? থাকলেও আমাকে নিয়ে নয়। ওদের চোখ মুখ হাসি দেখলেই সেটা বুঝতে পারি। টুকু আঁচল দিয়ে ওর মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, থাক, আর কিছু বললাম না।'

মেয়েরা নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে তাকিয়ে হাসল। ওদের এই হাসিতে যেন একটি বিশেষ অর্থ আছে, আর সেটা আছে টুকুর না বলা কথার মধ্যেই। যে কথাটা ও আমার সামনে বলাটা সমীচীন মনে করে না। আমি আবার বললাম, 'শেষবার দেখা করতে এসেছ, তাহলে তো একটু কিছু খেতেই হয়। কেবল আমাকেই তোমরা খাইয়ে দেবে।'

মেয়েরা সবাই একসঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানাল, ওরা কিছু খাবে না। ওদের হাতে সময়ও বেশি নেই। সব বেঁধে-ছেঁদে তৈরি হয়ে নিতে হবে। সর্বাণী বলল, 'চিঠি দিলে জবাব দেবেন তো?'

বললাম, 'আগে চিঠি দিও তারপরে দেখা যাবে।'

সর্বাণীই সকলের আগে আমার পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল। এবং কাউকেই বাধা দেওয়া গেল না। সকলেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, সকলের শেষে টুকু। তারপরে সকলে বিদায় নিয়ে চলে

গেল। গেটের কাছ থেকে সবাই একবার পিছন ফিরে তাকাল, কেবল টুকু ছাড়া। ও সকলের আগে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়েছে। আমি হেসে ঘাড় নাড়লাম। ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু এ মুহূর্তে আমি যেন একটু স্বস্তি বোধ করছি। টুকু যে ফিরে তাকাল না তাতেই আমি বুঝলাম সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাব্যিক মনের একটা কল্পনা বিলাস। তবে এটা ঠিক, আমার ভিতরে একটি কবিতার জন্ম হচ্ছে। নিজেকে নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। মন একটি বড় বিচিত্র বস্তু, সে প্রকৃতি মতই নানা ঋতুর আবর্তনে বিচিত্র বর্ণের লীলাস্থল। টুকুর সঙ্গে জীবনে আমার আর কোনদিন দেখা হবে না। কিন্তু এই দুটি দিনের মধ্যে আমার চেতনার আবর্তে অদ্ভুত অনুভবের মুহূর্তগুলো মনে থাকবে।

আবার আমি আমার সমুদ্র পারের প্রাত্যাহিকতায় ডুবে গেলাম। বিকালের দিকে আজ হেঁটে না বেড়িয়ে গাড়ি নিয়ে বেরোতে ইচ্ছা করল। তাই বেরোলাম। গাড়ি নিয়ে সমুদ্রের ধারে নেমে এক মুহূর্ত ভাবলাম। আজ খালের মোহনার দিকে না গিয়ে উড়িষ্যার সীমানার মধ্যে যেতে ইচ্ছা করল। চার মাইলের মধ্যেই চন্দ্রভাগা নদী। মোহনার সেই রূপটিও সুন্দর। সেদিকেই গাড়ি চালিয়ে দিলাম।

দীঘায় এখন সব সময় ভিড়, সব ঋতুতেই। কলকাতার এত কাছে বলেই বর্ষা কালেও ভিড় থাকে কী না জানি না। আমার বাঁ দিকে সমুদ্র। সেখানে বেলা শেষের রক্তিম আভা। হাওয়া প্রায় নেই। দূরে দূরে জেলেদের নৌকা দেখা যাচ্ছে, অনেক দূরে একটি লঞ্চও চোখে পড়ে। বোধহয় মাছের আড়তদারদের লঞ্চ। জেলেদের কাছ থেকে মাছ নিয়ে লঞ্চের মধ্যে বরফ চাপা দিয়ে রাখছে।

সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না। কিন্তু এখন

তার নিরন্তর গর্জন বেশ তীব্র, বড় বড় ঢেউ ভাঙছে। আমার ডান-দিকে ক্রমেই ঝাউবন পাতলা হয়ে আসছে। আসতে আসতে এক সময় শেষ হয়ে এল এবং বালুরাশি পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠছে। আর একটু এগিয়ে ডানদিকে বেঁকে গেলেই বালি পাহাড়ের সীমানা [illegible] গ্রাম পাওয়া যায়। আমি এখন উড়িষ্যা রাজ্যের মধ্যে [illegible]ছি। ডানদিকে, গ্রামের পথে মাইল খানেক কিংবা তার একটু বেশি গেলে চন্দনেশ্বর শিবের মন্দির আছে। আমি একবার হেঁটে গিয়েছিলাম। এসব বিষয়ে আমার একটু কৌতূহল বরাবরই আছে। মনে আছে, মাঠের পথে যেতে গিয়ে খানিকটা পথ আমাকে হাঁটু সমান জলের ওপর নিয়ে হেঁটে যেতে হয়েছিল।

কিন্তু মন্দিরটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। এমনিতে উড়িষ্যার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই মন্দিরটি তৈরি। খুব ছোটখাটোও না। বাঁধানো চত্বরটিও বেশ বড়। অথচ ভীষণ অপরিচ্ছন্ন। চারিদিকে নোংরা এবং আবর্জনা দুর্গন্ধে ভরা। স্বস্তি বোধ করিনি, তাছাড়া পুরীতে যেমন কুষ্ঠরোগীর ভিড় দেখা যায়, সেখানেও তাই দেখেছি। বেশিক্ষণ থাকিনি, তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছিলাম।

চন্দনেশ্বরের ভাবনায় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। সামনেই চোখে পড়ল একটি অ্যামবাসাডর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটা দরজা খোলা। কাছাকাছি হতে মনে হল ভিতরে একজন মহিলা এবং একজন পুরুষ বসে আছেন। আমি একটু ডানদিকে সরে গিয়ে এগোতে গেলাম, সেই সময়েই হঠাৎ ডাক শুনতে পেলাম, 'অনীশদা, অনীশদা!'

আমি ব্রেক কষলাম। নির্জন সমুদ্রতীরে আমাকে 'অনীশদা' বলে কে ডাকতে পারে। তাও আবার কণ্ঠস্বরটি কোনো মেয়ের। গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমি জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালাম। দেখলাম পিছনে ডানদিক থেকে একটি মেয়ে ছুটে আসছে। আর একটু আসতেই অবাক হয়ে দেখলাম, টুকু। টুকু এখানে কেমন করে। ওদের ক্যাম্প কি চলে যায়নি! আমার চোখে পড়ল, পিছন দিকে

বালির ঢিবির পাশ ঘেঁষে আরো একটি মেয়ে। দুটি যুবক বয়সের ছেলে এদিকেই তাকিয়ে দেখছে। আমি যোগাযোগটা ঠিক ধরতে পারছি না।

টুকু আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ও যে আমাকে 'অনীশদা' বলে ডাকতে পারে, ভাবতে পারিনি। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা যাওনি?'

টুকু বলল, 'ওরা সবাই চলে গেছে। আমি থেকে গেছি, আমার মা বোন সবাই তো এখানে রয়েছে।'

মনে পড়ে গেল টুকুর মা এখানে আছেন, কথাটা আগেই শুনেছিলাম। বললাম, 'হ্যাঁ, তুমি তো বলেছিলে।'

টুকু বলল, 'আমরা আরো দু-একদিন থাকব। আমি আপনার গাড়িটা দেখে ঠিক চিনতে পেরেছি। কোথায় যাচ্ছেন?'

'ভাবছিলাম, একটু চন্দ্রভাগা নদীর মোহনার দিকে যাব।'

টুকু বলল, 'আসুন না, আমাদের সঙ্গে একটু গল্প করবেন। আমার মায়ের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব, আসুন।'

এভাবে বললে অসম্মত হওয়া যায় না। বিশেষত কোন জরুরি কাজে যখন যাচ্ছি না। নেমে বললাম, 'চল।'

আমি টুকুর পাশে পাশে হেঁটে অ্যামবাসার গাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। এখন দেখছি টুকুর বেশভূষা সব অন্যরকম। জলপাই রঙের সিল্ক শাড়ি পরেছে, এবং তার বন্ধনী নাভির নিচে। একই রঙের স্লিভলেস্ জামা, পেট থেকে অনেক ওপরে, যেন তাকাতে ভয় করে। চোখে গাঢ় করে কাজল মাখা। ওর স্বাভাবিক লাল ঠোঁটের ওপরে আরো রঙ লেগেছে। গা থেকে বিদেশী সেন্টের গন্ধ ছড়াচ্ছে। চুল খোলা।

গাড়ির সামনে এসে গাড়ির সামনের আসনে বসে থাকা মহিলাকে উদ্দেশ্য করে টুকু বলল, 'মা, ইনি অনীশদা—অনীশ মিত্র।'

ভদ্রমহিলা ভেতর থেকেই হাত তুলে নমস্কার করে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন। এরকম একটা পরিস্থিতিতে পরিচয়ে আমি অস্বস্তি

বোধ করছি। নমস্কার বিনিময় করে বললাম, 'নামলেন কেন, আপনি বসুন।'

টুকুর মা বললেন, 'না না, সে কী। কী ভাগ্যি, আপনার সঙ্গে পরিচয় হল। টুকুর মুখে আজ সকালেই আপনার কথা শুনেছি, তখন ওরা আপনার বাড়ি যাচ্ছিল।'

টুকু আমার দিকে চেয়ে হাসল। টুকুর মা-ও সুন্দরী এবং টুকুর থেকে কম নন। যদিও তাঁর বয়স মনে হচ্ছে চল্লিশের ঊর্ধ্বে, তথাপি এখনো রূপ এবং লাবণ্য তাঁকে ঘিরে আছে। টুকুর মত এতটা না হলেও তিনি বেশ সেজেগুজেই আছেন। চোখে কাজল ঠোঁটে রঙ আছে, খুব বড় খোঁপা বেঁধেছেন। কিন্তু ড্রাইভারের আসনে যিনি বসে আছেন তাঁর কোন পরিচয় এখনো পাচ্ছি না কেন বুঝতে পারছি না। টুকুর মা-ই বললেন, 'তোমার কাকার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দাও।'

ভদ্রলোক নিজেই এবার নেমে এলেন। হাত তুলে নমস্কার করলেন। টুকু বললে, 'ইনি আমার কাকা, ভবতোষ চ্যাটার্জি।'

ভদ্রলোককে দেখে এমনিতেও টুকুর বাবা বলে মনে করা যায় না। বয়স বোধ হয় চল্লিশের নিচেই। রঙটা কালো। অবিশ্যি কালো পিতার ফরসা সন্তান হয় না তা মনে করি না। কিন্তু টুকুর সঙ্গে ভবতোষ চ্যাটার্জির চোখ মুখের কোথাও কোন মিল নেই। বরং বিপরীত। পুরোপুরি স্যুটেড বুটেড।

টুকুর মা বললেন, 'টুকুর বাবাকে তো আমরা ধরতে ছুঁতে পারি না। উনি থাকেন খালি কাজ আর কাজ নিয়ে। আমাকে বেরোতে হলে ছেলেমেয়ে নিয়ে একলাই বেরোতে হয়। না হলে এই চ্যাটার্জি আছে, ওকে জ্বালাই।'

ভবতোষ যেন একটু লজ্জিত হল, বলল, 'জ্বালাই বলছ কেন। আমিও বেড়াতে ভালবাসি।'

টুকুর মা ভবতোষের দিকে চেয়ে একটু যেন নিবিড় চোখে হাসলেন। আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আর কত-দিন আছেন?'

বললাম, 'ক'দিন আর। হয়তো চার পাঁচ দিন আরো থাকব। অথবা তার আগেই চলে যেতে পারি।'

টুকুর মা বললেন, 'সে তো বটেই। গাড়ি নিয়ে এসেছেন, যখন খুশি বেরিয়ে পড়লেই হল। কলকাতায় আপনাদের বাড়ি কোথায়?'

বললাম। উনি বললেন, 'আমরা আপনার বেশি দূরে না, ভবানী-পুরে থাকি। কলকাতায় একদিন আমাদের বাড়িতে আসবেন।'

ভদ্রতা করে বলতে হল, 'যাব।'

আমি বিদায় নেবার জন্য এবার টুকুর দিকে তাকালাম। টুকু বালির ঢিবির দিকে দেখিয়ে বলল, 'আমাদের ওখানে চলুন।'

আমি হেসে টুকুর মায়ের দিকে তাকালাম। তিনি তাঁর কাজল মাখা ডাগর চোখে আমাকে যেন পা থেকে মাথা পর্যন্ত মেপে নিলেন। মনে হল, তাঁর দৃষ্টি প্রশংসায় উজ্জ্বল। দুজনকেই বললাম, 'চলি।'

টুকুর সঙ্গে চলতে গিয়ে বললাম, 'তোমরা গল্প কর আমি চলি।'

টুকু ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, আসুন না, আমার ছোট বোনকে দেখবেন না?'

সেটাও একটা কথা। মায়ের সঙ্গে পরিচয় হল, বোনকেও একটু দেখতে হবে। টুকু চলতে চলতে কয়েকবার আমার দিকে চেয়ে হাসল, হাসিতে যেন একটু লজ্জার আভাস। চোখে সেই দূরাগত রহস্যের ঝিলিক। ও প্রায় আমার গা ঘেঁষে চলেছে। মাঝে মাঝে শাড়ির আঁচল লেগে যাচ্ছে। চকিত মুহূর্তের জন্য ওর সেই জড়িয়ে ধরা স্পর্শের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমার শরীরে যেন একটা বিদ্যুতের চমক খেলে গেল।

কাছে গিয়ে দেখলাম তিনজন দাঁড়িয়ে আছে। আমার দিকেই তাকিয়ে দেখছে। ছেলে দুটির বয়স বিশ বাইশের মধ্যেই। আধুনিক ছেলেদের মত, ওদের কোমরে বেল্ট বাঁধা আঁটসাঁট ট্রাউজার। হাইকলার সার্ট। টুকুর বোন চুস্ত পায়জামার ওপরে পাঞ্জাবী পরে

আছে। টুকুর থেকে রঙটা যেন একটু ময়লা। চোখ মুখ স্বাস্থ্য টুকুই মতই।

টুকু পরিচয় করিয়ে দিল, 'এই আমার ছোট বোন খুকু। আমার দাদা প্রদীপ, আর দাদার বন্ধু অলক।'

ওদের দিকে ফিরে বলল, 'ইনি অনীশ মিত্র।'

ওরা হাসি মুখে সবাই নমস্কার করল। জানি না ওরা আমার নাম কখনো শুনেছে কী না। সামনেই একটা ছোট টুলের ওপর দেখছি লেটেস্ট মডেলের একটি রেকর্ড-প্লেয়ার রয়েছে। কয়েকটি রেকর্ড। এখন রেকর্ড লাগানো রয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা গান শুনছিলে নাকি?'

টুকু বলল, 'না, আমরা রেকর্ড চালিয়ে নাচছিলাম।'

বললাম, 'বাহ্, এই তো বেশ বেড়াবার মজা।'

টুকু বলল, 'সেইজন্যই তো এত দূরে চলে এসেছি। আপনি নাচতে পারেন?'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'নাচ? কী নাচ বল তো?'

টুকু ঝকঝকে দাঁতে হেসে বলল, 'এখানে রেকর্ড বাজিয়ে সবাই মিলে আবার কী নাচব। টুইস্ট।'

বললাম, 'না, ওটা আমি পারি না। আমি অবিশ্যি কোন নাচই পারি না।'

টুকুর বোন খুকু বলে উঠল, 'তা হলে আমরা নাচি, আপনি দেখুন।'

প্রদীপ আর অলক হাসল। কিন্তু আমি কি এদের টুইস্ট উপভোগ করতে পারব। তবে ছোট মেয়ে বলছে, দেখা যাক।

টুকু বলে উঠল, 'আমি কিন্তু নাচব না।' বলে, আমার দিকে তাকাল।

আমার সামনে লজ্জা পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার জন্য?'

খুকু বলল, 'না দিদি, তোমাকেও নাচতে হবে।' আমাকে বলল, 'আপনি বলুন ওকে নাচতে। ও আমাদের মধ্যে সব থেকে ভাল নাচে।'

আমি টুকুর দিকে তাকালাম। টুকু আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমার ভিতরে চমক লাগছে। ওর দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত যেন চোখ ফেরাতে ভুলে গেলাম। পরমুহূর্তেই নিজেকে যেন ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, 'তাহলে তো তোমাকে নাচতেই হয়।'

টুকু মুখ নামিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। খুকু ইতিমধ্যে রেকর্ড চালিয়ে দিয়েছে। বিদেশী সঙ্গীত। অস্বীকার করা যায় না, এ ধরনের গান এবং মিউজিক বেজে উঠলেই শরীরে একটা তাল লেগে যায়, পায়ের পাতা আপনা থেকেই নড়ে ওঠে।

প্রদীপ অলক এবং খুকু শুরু করল। খুকু নাচতে নাচতেই ঈশারায় টুকুতে ডাকল। টুকু একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর নাচতে আরম্ভ করল। যে টুকুকে আমি ওর কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে দেখেছি এখন আর সেই মেয়েটিকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। সত্যি কথা বলতে কী, এখন যেন ওকে অনেকটা রঙ্গিণী যুবতীর মত মনে হচ্ছে। ওর নাভির নিচের শাড়ির বন্ধনী, আঁচলটাকে এমন ভাবে বুকের খানিকটা অংশ ঢেকে কোমরে গুঁজে নিয়েছে, ওর রৌদ্র রঙ পেট এবং সমস্ত মেদহীন নাভিস্থল দেখা যাচ্ছে। কেবল দেখাই যাচ্ছে না, ইংরেজিতে যাকে বলে বেলি ড্যান্স, অনেকটা সেই ভাবেই ওর নাভিস্থলের পেশি বাজনার তালে তালে কাঁপছে। নানান্ অঙ্গভঙ্গিতে ওর কোমর বাহু বুক সবই এই বিশেষ নাচের ছন্দে ওঠানামা করছে। সবাই যে এক রকম নাচছে, তা না, দুই দুই জুটিতে দু'রকম। প্রদীপ নাচছে খুকুর মুখোমুখি, অলক টুকুর সামনে। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, সব থেকে আকর্ষণীয় অঙ্গভঙ্গি টুকুরই। মাঝে মাঝে দেখছি টুকু ভুরু চোখ এবং ঠোঁটেরও একটু ভঙ্গি করছে, যেটা ওর নাচের মধ্যে এনে দিচ্ছে অন্য একটা নতুন স্বাদ।

বিশ্বভুবন ঘুরে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এ নাচ দেখেছি। তবে আমি কোনদিনই এ নাচে অংশ নিইনি, বিশেষ করে এ নাচেই, কেন না আমার রুচিতে ঠিক আসে না। তবে পশ্চিমী অন্যান্য নৃত্য আমি শিখেছিলাম। অনেক সময়ে, সামাজিকতা বজায় রাখবার জন্যই

তার বিশেষ দরকার ছিল। তাছাড়া, এই টুইস্ট নাচের অনুষ্ঠানটা আজকাল এতই সুলভ ব্যাপার, একটু আধুনিক যে কোন বাড়িতেই ছেলেমেয়েরা নেচে থাকে। আমাদের বাড়িতেও হয়, স্বয়ং আমার কনিষ্ঠ ভাই মনীশ এবং ওর স্ত্রী দুজনেই এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহী। সপ্তাহের ছুটিতে প্রায়ই বাড়িতে ওর বন্ধুরা সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হয়ে আসে, পান ভোজন এবং টুইস্ট হয়। আমি সে আসরে বড় একটা যাই না, যদিও ওরা টানাটানি করে।

কিন্তু যা-ই ভাবি বা বলি না কেন, এখন এই অসীম সমুদ্রের কূলে দাঁড়িয়ে আমি যেন টুকুর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। এই সমুদ্রতীরের সব কিছুর মতই যেন আমার ভিতরের অবস্থা। এই সীমাহীন সমুদ্রের মতই একটা দূরপারের অপরিচিত অনুভূতি আমার মধ্যে জাগছে, অথচ এই সফেন গর্জিত ঢেউ যেন আমার বুকেই উথালিপাথালি করে ভাঙছে। আমাদের কাছ থেকে কিছু দূরেই দেখতে পাচ্ছি এক ঝাঁক কাদাখোঁচা পাখি পলির পোকা খাবার জন্য ছড়িয়ে আছে। তারা এই বাজনার শব্দে চকিত ভীরু চোখে এদিকে তাকিয়ে দেখছে, পালাবে বিনা বুঝতে পারছে না।

লঙ্‌প্লেয়িং রেকর্ড বাজছে একটানা, নানা সুরে গান বেজে চলেছে। কিন্তু সবগুলো গানেই রয়েছে নাচের ছন্দ। নাচের সময় টুকু একবারও আমার দিকে ফিরে তাকায় নি। আমি চোখ ফেরাতে পারছি না। অথচ আমি তো জীবনে অনেক সুন্দরী যুবতীদের এ নাচ নাচতে দেখেছি। আমার মনের অবস্থা তো কখনো এরকম হয়নি। শেষ মুহূর্তের নাচে দেখলাম টুকু বুকের ওপর দু'হাত আড়াআড়ি জড়ো করে, যাকে বলে আর্চ করা সেই রকম বৃত্তকারে বেঁকে গেল। ওর চুল পিছন দিকে ঝুলে পড়ল। এখন ওর মেদ বর্জিত মসৃণ ফর্সা নাভিস্থলের দিকে চোখ পড়তে আমার যেন বুক কাঁপছে। অলক ওর সামনে দাঁড়িয়ে কেবল তালে তালে হাত পা দোলাচ্ছে।

রেকর্ড শেষ হল, নাচ থামল। ওরা সবাই মিলে হাততালি দিয়ে উঠল। টুকু আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওর মুখ এখন লাল

হয়ে উঠেছে, ঠোঁটের ওপরে, নাকের ডগায় চোখের কোলে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। এখন আমি কোন কথা বলতে পারছি না। টুকু আমার সামনে এসে দাঁড়াল। একটু যেন লজ্জা মেশানো হাসি ওর মুখে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যেন সেই দূর অচিন পারাবারের ইশারা।

টুকু বলল, 'আপনার ভাল লাগেনি না?'

আমি সম্বিত ফিরে পেলাম। বললাম, 'ভাল লাগবে না কেন, তুমি তো বেশ ভালই নাচলে।'

টুকু ঘাড় কাত করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তবে কিছু বলছেন না যে?'

আমি নিজেকে সামলে নিয়ে স্বাভাবিক ভাবে হেসে বলে উঠলাম, 'ওহ্, আমি হাততালি দিইনি বলে বুঝি ভেবেছ আমার ভাল লাগেনি।' বলে আমি জোরে হাততালি দিয়ে উঠলাম। খুকু প্রদীপ অলকের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমরা সকলেই খুব ভাল নেচেছ।'

খুকু বলল, 'দিদির মত আমরা কেউ নাচতে পারি না। অলকদা অবিশ্যি খুব ভাল নাচতে পারে।'

অলক একটু লজ্জিত হেসে বলল, 'খুকুটা বাজে বকছে। এখানে এই বালি আর মাটির ওপরে পা চলতেই চায় না।'

টুকু বলে উঠল, 'সত্যি, পা বেধে যায়।'

আমি জানি না অলকের সঙ্গে টুকুর কেমন সম্পর্ক। দাদার বন্ধু এবং এ বয়সেও প্রণয় হয় তা জানি। কথাটা মনে হতেই, জীবনে, এই বয়সে বোধ হয় প্রথম যেন একটা ঈর্ষার অনুভূতি আমাকে বিদ্ধ করল। কিন্তু আমি হেসেই টুকুকে বললাম, 'আচ্ছা, আমি এবার চলি কেমন?'

টুকুর চোখেও যেন একটু হাসির ঝিলিক দেখা গেল, তার সঙ্গে একটি লজ্জার আবেশ। বলল, 'আমি যাব আপনার সঙ্গে?'

জবাব দিতে আমার এক মুহূর্ত দেরী হল। ভাবলাম সেটা কি

ঠিক হবে। বাইরের সাধারণ চোখে দেখতে গেলে কিছুই না। কলেজের প্রথম বছরের ছাত্রী, একটি মেয়ে ক্যাম্পে পরিচয়, আমার মত একটি লোকের সঙ্গে যদি একটু বেড়াতে যাবার আবদার করে তাতে কিছুই মনে করবার নেই। যদিও এখন আর টুকুকে যেন ঠিক ছাত্রীর পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাছাড়া আমার নিজের ভিতরের ব্যাপারটাও তো আছে। যেন একটু দ্বিধা করেই বললাম, 'যাবে?'

টুকুর হাসিটা এখন সরল। বলল, 'আপনার অসুবিধা হবে না তো?'

এভাবে বললে সেটা স্বীকার করা যায় না। হেসে বললাম, 'আমার আবার কী অসুবিধে হবে। তুমি যাবে তো চল। তুমি একলাই যাবে?'

টুকু বলল, 'হ্যাঁ। আমি একলাই যাব।'

বলেই টুকু গাড়িতে বসা ওর মায়ের দিকে ফিরে গলা চড়িয়ে বলল, 'মা, আমি অনীশদার সঙ্গে একটু বেড়াতে যাচ্ছি।'

টুকুর মা গাড়ির জানালা দিয়ে সম্মতিসূচক হাত নাড়লেন। টুকু আবার বলল, 'আমাদের দেরি দেখলে, তোমরা চলে যেও। আমি অনীশদার সঙ্গে ট্যুরিস্ট লজে ফিরে যাব।'

ওর মা সেই ভাবেই হাত নাড়লেন। আমি তবু খুকুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কেউ যাবে?'

খুকু বলল, 'না, আমরা এখানেই থাকি।'

আমি টুকুর দিকে তাকালাম। আমার গাড়ির দিকে এগিয়ে চললাম। ও আমার পাশাপাশি চলল। বুঝতে পারছি না ভাগ্য আমাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। আমি কোনদিন আমার কোষ্ঠীর ফলাফল জানি না। বয়সের এই লগ্নে কি জীবন কোথাও বাঁক নিতে চলেছে। বিশ্বাস করতে পারি না। টুকু নিজেই বাঁদিকে গিয়ে, দরজা খুলে উঠে বসল। আমি গাড়ি স্টার্ট করতেই, একটু দূরের কাদাখোঁচার ঝাঁক একসঙ্গে বালির উঁচু ঢিবির দিকে উড়ে গেল। টুকু বলে উঠল, 'কী সুন্দর।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'ওগুলো কী পাখি, জানো ?'

টুকু একটু ভেবে ভুরু কুঁচকে বলল, 'না। আপনি জানেন কী পাখি ?'

'জানি, ওগুলো স্নাইপ, যাকে বলে কাদাখোঁচা। অনেকে ওদের মাংস খায়।'

'আমি কোনদিন খাইনি। কিন্তু আমি চিকেন ডাক এসব খেয়েছি।'

হেসে বললাম, 'তাই নাকি ? তাহলে তোমার স্নাইপও খেতে ভাল লাগবে।'

বালির ঢিবি বাড়ছে। সমুদ্র তীরে মানুষ নেই। কিন্তু প্রায়ই পাখির ঝাঁক, আমাদের গাড়ির আওয়াজ পেয়েই আকাশে উড়ে যাচ্ছে। টুকু সে-সব দেখছে। একবার বলল, 'আমরা এত দূরে কোনদিন আসিনি। এটা তো উড়িষ্যা, না ?'

'হ্যাঁ। তোমাদের গাড়ি যেখানে রয়েছে, সেখানটাও উড়িষ্যার মধ্যেই।'

'আপনি খুব বেরিয়ে বেড়ান, না ?'

কৌতূহলী টুকুর দিকে একবার দেখে হেসে বললাম, 'খুব বেড়িয়ে বেড়াবার ছুটি পাব কী করে বল। আমাকে তো চাকরি করতে হয়।'

ও বলল, 'হ্যাঁ, সীতাদি বলেছিলেন, আপনি বিলেত-ফেরত ইঞ্জিনীয়ার।'

আমি এবার জোরে হেসে উঠলাম। টুকুকে দেখলাম ও যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, 'বা রে, এতে হাসবার কী আছে, সত্যি তো আপনি তা-ই।'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, তা-ই।'

তারপরেই টুকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা অনীশদা, মা যে আপনাকে আমাদের বাড়িতে যেতে বললেন, সত্যি আসবেন ?'

বললাম, 'সময় সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই যাব।'

টুকু বলল, 'তখন বৌদিকেও নিয়ে আসবেন, কেমন ?'

boiboi.net

ও কথাটা বলল খুব সহজে, ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতার সঙ্গে। আর সেটা বোধ হয় খুবই স্বাভাবিক। আমি ওর দিকে না তাকিয়ে, সামনের দিকেই তাকিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি। একটু হেসে বললাম, 'কিন্তু বৌদি তো নেই।'

টুকু আমার মুখের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল। ঠিক কী বলবে যেন বুঝতে পারছে না। বোধ হয় অনেক কিছু ভেবে নিচ্ছে। আমি ওর দিকে তাকালাম। ও দ্বিধার সঙ্গে বলল, 'কেন, উনি বুঝি কোথাও গেছেন?'

হেসেই ঘাড় নেড়ে বললাম, 'না। আসলে তিনি নেই। তুমি বুঝি ভেবেছ, সকলকেই বিয়ে করতে হবে?'

টুকু একেবারে মেয়েলি ভঙ্গিতে বলল, 'ও মা, আপনি বিয়ে করেন নি এখনো?'

আমি গলা খুলে হাসলাম। ওকে এবার সত্যি ছেলেমানুষই মনে হচ্ছে। বললাম, 'আমার মত বুড়ো মানুষকে দেখলে, সবাই অবিশ্যি তা-ই ভাবে।'

টুকু বলে উঠল, 'আহা, আপনি বুঝি বুড়ো? মোটেই না।'

আমি এবার টুকুর দিকে তাকালাম। ও আমার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। দৃষ্টিতে কোন মিথ্যাচার বা ছলনা দেখতে পাচ্ছি না। বললাম, 'ভাল করে তাকিয়ে দেখ, আমার চুল পেকে গিয়েছে, এবার দাঁত পড়বে।'

টুকু খিলখিল করে হেসে উঠল, বলল, 'ইস্, মোটেই আপনার দাঁত পড়বে না। চুল পাকলেও আপনাকে এখন কেউ বুড়ো বলবে না। কাল আপনাকে আমি চান করবার সময় সমুদ্রের ধারে বুঝি দেখিনি?'

'কী দেখলে?'

'আপনার ফিগারটা দারুণ।'

না হেসে পারলাম না। টুকু এবার আমাকে একটু লজ্জাতেই ফেলে দিল। আমার মনে আছে, কাল গা থেকে তোয়ালেটা

খোলার পরে টুকু আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। তারপরে জলে নেমে ওর সেই সভয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরার কথা আমি এখন সভয়েই আর মনে করতে চাই না। আমি ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওর অপলক চোখ আমার দিকে। ওর ঠোঁটের হাসিতে, চোখের গভীরে যেন কী একটা কথা স্তব্ধ হয়ে আছে। আমিই জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল টুকু ?'

টুকু একবার চোখের পাতা নামাল। একবার ঘাড় নাড়ল। আবার চোখ তুলে তাকাল। বললাম, 'কিছু বলবে মনে হচ্ছে।'

টুকু তবু কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। এখন আর রোদ নেই। সূর্য কোথায় অস্ত যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি না। সমুদ্রে এবং আকাশে লালের ছোঁয়া লেগেছে। টুকুর মুখেও যেন সেই লালেরই ছোঁয়া লেগেছে, ওর মুখে রক্তিম ছটা। বলল, 'প্রথম দিন, পরশু বিকেলে আমরা যখন সমুদ্রের ধার থেকে ক্যাম্পে ফিরছিলাম, তখন আপনাকে আমরা প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম। তারপরে সাতাদি।'

বললাম, 'হ্যাঁ, সেই রকমই তো ঘটেছিল মনে হচ্ছে।'

টুকু বলল, 'তখন কয়েকটা মেয়ে আপনাকে দেখে কি বলেছিল শুনেছিলেন ?'

আমি এবার একটু সাবধান হবার চেষ্টা করলাম। সব কথাই আমার মনে আছে। একটু গম্ভীর ভাবে বললাম, 'তুমিও তাদের মধ্যে ছিলে না কি ?'

আমার প্রশ্নটা সোজাভাবে এড়িয়ে গিয়ে টুকু বলল, 'তখন কী করে জানব, আপনি এত বড় একজন কবি পণ্ডিত, তার ওপরে মস্ত ইঞ্জিনীয়ার।'

আমি নিঃশব্দে হাসলাম, কোন জবাব দিলাম না। পরশু বিকেলে ব্যাপারটাকে আমি প্রসন্নভাবেই নিয়েছিলাম। এখন যেন সহসা মনে হল আমি বোধহয় আমার আত্মসম্ভ্রমকে একটু ছোট করে ফেলেছি। যদিও টুকু আমাকে কোনরকম অসম্মান করেনি, বা অসম্মানজনক কথাবার্তাও বলেনি। তথাপি যেন আমার মনটা একটু খচ্‌খচ্‌ করতে

লাগল। আমি অবিশ্যি কোন সময়েই মুখ গোমড়া লোক নই। এমন কি চাকরি-স্থলে কোন গাম্ভীর্যের মুখোশ পরে থাকি না। ভয় হয় পাছে আমার অনায়াস সহজ আচরণকে টুকু কোনরকম ভুল বোঝে। ব্যাকগ্রাউণ্ড বলতে যা বোঝায় টুকুর সে-সব আমি এখনো কিছুই জানি না। যেটুকু দেখেছি তাতে কিছুই অনুমান করা যায় না। শুধু এইটুকু অনুমান করা যায়, ওর মধ্যে তেমন গভীরতা নেই, যা ওরই বয়সী মেয়ে সর্বাণী বা ঋতার মধ্যে কিছুটা আছে। মনে পড়ে যায় ওর গানের কথা। ভক্তিমূলক মীরার ভজন গানে একটা হালকা চটুলতাই ফুটে উঠেছিল। তারপরে আজ এই সমুদ্রের ধারে বিদেশী গান-বাজনার সঙ্গে টুইস্ট, এবং এটাও আমি বুঝি, ও আমার কবিতা বা প্রবন্ধের কোন বই পড়েনি। অনীশ মিত্র বলে কারো নাম ও কখনো শোনেনি। আমাকে দেখার পরে পরিচয় পেয়ে, আর আমার গল্প বলা শুনে হয়তো আমার সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিয়েছে।

তথাপি মনে পড়ে যায় ওর সেই নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি, যে চোখের কথা, যে চোখের দৃষ্টি আর ঠোঁটের কোণের হাসি দেখে আমি বারে বারেই চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল যেন কী এক দূর পারের ডাক। একটা রহস্যের মায়া, একটা কুহকের হাতছানি রয়েছে ওর চোখে, হাসিতে। কয়েক বারই সে-রকম দেখেছি।

টুকু বলল, 'আপনি রাগ করেছেন ?'

বললাম, 'না, রাগ করব কেন। আসলে তুমি খুব দুষ্টু মেয়ে।'

বলে ওর দিকে তাকালাম, আবার সেই বিদ্যুৎচমক লাগল। ওর চোখে সেই দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে সেই হাসি। বাতাসে ওর চুল উড়ছে, আর ওর সেই মুখের পটে, সমুদ্রের ঢেউ উঠছে, ভাঙছে এবং সুদূর আকাশের গায়ে অশেষে হারিয়ে গিয়েছে। আমি সামনে ফিরে তাকালাম। দূরে চন্দ্রাভাগার মোহনা দেখা যাচ্ছে। ডাননিকে দূরে কিছু গাছপালা দেখা যাচ্ছে।

কয়েকজন জেলে মাঝিকে এখানে ওখানে চোখে পড়ছে।

আমি ওর দিকে তাকালাম। তেমনি তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস

পাতা মুড়বেন না

করলাম, 'কী দেখছ বল তো ?'

টুকু যেন অনেক দূর থেকে বলল, 'আপনাকে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী দেখছ ?'

'কী আবার, আপনাকেই, এমনি। আপনাকে দেখতে খুব সুন্দর।'

দেখলাম, ওর চোখের তারা এবার নড়ল, হাসিটা একটু বিস্তৃত হল ঠোঁটে। সেই রহস্যের ছায়াটা যেন সরে গেল। আমি না হেসে পারলাম না। মুখ ফিরিয়ে গাড়ির গতি কমালাম। একেবারে মোহনার সামনে যাওয়া চলে না। গাড়ি দাঁড় করালাম। একটু দূরেই এক ঝাঁক পাখি একটু সরে সরে গেল, উড়ে পালিয়ে গেল না। এখানে জেলে মাঝিদের ভিড় একটু আছে। কেউ কেউ জাল বুনছে। গোটা দুয়েক লরি একপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

টুকু গাড়ি থেকে নেমেই পাখিগুলোর দিকে ছুটে গেল। পাখিরাও মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে গেল। টুকু আমার দিকে পিছন ফিরে একবার দেখল। তারপরে সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে এগিয়ে গেল। আমি গাড়ি থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরালাম। টুকুর মায়ের মুখটা আমার মনে পড়ল। রীতিমত সুন্দরীই বলতে হবে। তিনি তাঁর দেবরের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে এসেছেন। হয়তো এ সময়ে দীঘায় বেড়াতে আসার কারণ টুকুর ক্যাম্পের জন্য। ওর দাদা বোন এবং দাদার বন্ধু, সব মিলিয়ে মনে হয় আধুনিক বলতে যা বোঝায় ওদের পরিবার বোধ হয় সেইরকম। কিন্তু আধুনিকতার ছাপটা চিন্তা ভাবনার মধ্যে কোথাও তেমন দেখা যাচ্ছে না।

আমি শুনতে পেলাম টুকু ডাকছে, 'অনীশদা।'

তাকিয়ে দেখলাম, ও আমাকে হাত তুলে ডাকছে। আমি ওর কাছে গেলাম। বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?'

'এমনি, দেখছি সব।'

'আমার ইচ্ছে করছে এখন সমুদ্রে চান করি।'

'সে কি, তুমি তো সাঁতারই জানো না।'

boiRboi.net

টুকু আমার দিকে চেয়ে বলল, 'বা রে আপনি আছেন তো।'

হেসে বললাম, 'তা বটে। কিন্তু এখন এই পোশাকে তো চান করতে পারব না।'

টুকু বলল, 'এমনি বললাম। চলুন একটু হেঁটে মোহনার দিকে যাই।'

ও নিজেই আগে আগে হাঁটতে আরম্ভ করল। আমি আস্তে আস্তে এগোলাম। সহসাই আমার মনে হল, টুকুর যে রকম গানের গলা এবং গলায় যে কাজ আছে, ও যদি ঠিক মত শিক্ষা পেত তাহলে জীবনে উন্নতি কবতে পারত। শুধু তাই না, আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ওর শরীরের যা গঠন এবং শরীরকে যে ভাবে খেলাতে পারে, বৃত্তাকারে বেঁকে যেতে পারে, ভাল নাচও শিখতে পারে। ও নিজে কি তা জানে? অথবা ওর অভিভাবকরা?

দেখছি টুকু এগিয়ে গিয়ে কয়েকজন উড়িয়া মাঝিদের সঙ্গে গল্প করছে। এই মাঝিরা ঠিক পুরীর সমুদ্রধারের নুলিয়া জাতীয় নয়। দেখতে দেখতেই ছায়া নেমে এল। এখন আর পাখিরা নেই। কয়েকটা পাতার ঘর রয়েছে। সেখানে আলো জ্বলে উঠছে। আমি টুকুকে ডেকে বললাম, 'চল, এবার ফিরে যাওয়া যাক। অন্ধকার নামছে। তোমার মা ভাববেন।'

টুকু উদাস গলায় বলল, 'ভাববার কী আছে?'

'দেরী হলে ভাববেন না?'

'মা জানেন, ভাববার কিছু নেই।'

টুকুর কথায় কি একটা বিরূপতা রয়েছে। বললাম, 'অন্ধকারে আর কী-ই বা দেখব এখানে। চল ফিরি।'

'চলুন।'

টুকু গাড়িতে উঠে আমার একটু কাছে সরে এসে বসল। গাড়ি স্টার্ট করলাম, ড্যাশবোর্ডের আলোয় টুকুকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। দেখলাম ও সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে। ওর চুল উড়ছে, মিশ্রিত একটা সুগন্ধ ছড়াচ্ছে। কিন্তু টুকুকে যেন একটু অন্যমনস্ক লাগছে।

এরকম ওকে দেখিনি।

আমি কিছু বললাম না। টুকু হয়তো কিছু ভাবছে। দ্রুত গাড়ি চালিয়ে অনেকখানি আসার পরে দূরে দীঘার সমুদ্রের ধারের আলো দেখা গেল। টুকু বলে উঠল, 'এখন আমার মনে হচ্ছে সমুদ্রের ধার দিয়ে এমনি করে কেবলই চলতে থাকি।'

ওর গলার স্বরটা যেন উদাস শোনাচ্ছে। আমি হেসে বললাম, 'কেবল চলতে থাকার মত পথ তো বেশি দূর পাবে না। কিন্তু তোমার মা ভাই বোন কাকা সকলের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না?'

টুকু এক কথাতেই জবাব দিল, 'না।'

এ জবাবটা আশা করিনি। এ রকমই যদি ওর ইচ্ছা তবে ক্যাম্পের মেয়েদের সঙ্গে ফিরে গেল না কেন। কথাটা আমাকে অবাক করল। আবার বলে উঠল টুকু, 'এক এক সময় আমার কিছু ভাল লাগে না। মনে হয়, সব ছেড়ে ছুড়ে কোথাও চলে যাই।'

এ যেন আবার আর এক টুকু কথা বলছে। পরিচয়ের পরে ওকে এ রকম কখনো দেখিনি। আমি হালকা হাসির ভঙ্গিতেই বললাম, 'একেবারে সব ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করে? সে আবার কেমন কথা? কোথায় যেতে ইচ্ছে করে!'

টুকু বলল, 'তা জানি না।'

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম। ছেলেমানুষি ছাড়া কিছুই না। হয়তো কোন কারণে মন খারাপ হয়েছে, কারো ওপরে মনে মনে অভিমান হয়েছে। সেই জন্যই এ রকম বলছে। অবিশ্যি আমি কিছুই বুঝি না। আমার অনুমান মাত্র। আমি ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। ও বাইরের দিকে চেয়ে আছে। আমি হাসি বজায় রেখেই বললাম, 'সবাই মিলে নাচ গান কর গিয়ে।'

টুকু বলল, 'আমার ভাল লাগছে না।'

ফিরে আসতে আসতেই এর মধ্যে টুকুর কী হল যে, মা ভাই বোনকেও ভাল লাগছে না। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কৌতূহল প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। আলোর কাছাকাছি এসে আমি গাড়ির গতি

boiRboi.net

কমালাম। এখনো সমুদ্রের ধারে অনেক লোকের ভিড়। আমি বাঁ দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে রাস্তার উপরে উঠে এলাম। ট্যুরিস্ট লজের কাছে এসে গাড়ি থামাবার উদ্যোগ করতেই ও বলে উঠল, 'আমি এখন এখানে যাব না। আমি সমুদ্রের ধারেই যাব।'

আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললাম, 'একলা একলা?'

'না, মনে হয় খুকুরা এখনো নিশ্চয় সমুদ্রের ধারেই আছে।'

আমি বললাম, 'চল, আমি তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।'

টুকু বলল, 'না না, আপনি আবার যাবেন কেন, আপনাকে তো এ রাস্তাতেই যেতে হবে।'

টুকুকে এখন যেন একটু বেশি ভারি মনে হচ্ছে। ওর হালকা চপলতা বুঝতে পারি। এ রকম ভদ্রতা করবে ভাবিনি। আমি বললাম, 'কেন আবার হেঁটে হেঁটে যাবে, চল, রাস্তাটুকু পার করে দিয়ে আসি।'

আমি সমুদ্রের ধারের রাস্তায় এসে গাড়ি দাঁড় করালাম, নিচে নামলাম না। টুকু আমার দিকে তাকাল। হাসছে, কিন্তু এ হাসি অন্যরকম। বলল, 'যাচ্ছি অনীশদা। কাল আবার কখন দেখা হবে আপনার সঙ্গে?'

বললাম, 'বেরোলেই দেখা হবে। সমুদ্রের ধারে তো আসতেই হবে।'

টুকু বলল, 'আপনাকে আমি খুঁজে বের করে নেব।'

হেসে বললাম, 'আচ্ছা।'

টুকু নেমে গেল গাড়ি থেকে। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে এল। জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি দেখ খুকুরা ওখানে নেই, তবে কি করবে?'

টুকু বলল, 'একলা একলাই খানিকটা বেড়াব।'

ও আবার হাসল। হাসিটা ম্লান, এ হাসিতে বক্রতা নেই, রহস্য নেই। নিচে নেমে গেল। ওর এই ধীরে ধীরে সমুদ্রের ধারের দিকে নেমে যাওয়াটা করুণ মনে হচ্ছে। মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কোথায় যেন কী ঘটে গেল, জানি না। এ বয়সের বা কোন বয়সেরই মেয়েদের

মন আমি চিনি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি, মানুষকে এক ঝলক দেখেই, তার সবখানি বোঝা যায় না। আমি গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে নিজের আস্তানার দিকে চললাম।

পরের দিন যথা নিয়মেই আমি প্রাতরাশের পর সমুদ্রে সাঁতার কাটতে গেলাম। গাড়িটা সমুদ্রের ধারের ঢালুতে নামিয়ে, বাঁদিকে বাঁকবার আগেই দেখতে পেলাম অলক টুকুকে ধরে জলের দিকে টানছে। টুকু যেতে চাইছে না। খুকু আর প্রদীপ মজা দেখছে, হাসছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন খুকুর মা আর কাকা। দুজনেই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে হাসছেন। টুকুকে নিয়ে অলকের টানাটানি অনেকেই দেখছে। কে কী ভাবছে জানি না। কিন্তু আমার মনে কি কোনরকম কাঁটা খচখচ করছে? ভাবতেও লজ্জা বোধ করছি। অনীশ মিত্রের এ রকম হতে পারে না। আমি গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম। যথা নিয়মে কফি সিগারেট বই নিয়ে বসে গেলাম।

অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছে। কতক্ষণ কেটেছে, ঠিক জানি না। একটা শব্দ পেয়ে মুখ তুললাম। কারোকে কোথাও দেখতে পেলাম না। বোধহয় ভুল শুনেছি। অথবা ঝাউবনে কোন শব্দ হয়ে থাকবে। আমি আবার বইয়ের দিকে মনোযোগ দিলাম। আবার শব্দ হল, মনে হল গাড়ির গায়ে। গাড়ির দিকে ফিরে তাকালাম, আর গাড়ির পিছন দিকে নিচে দুটি পা দেখতে পেলাম। ভেজা ফরসা পায়ে বালু জড়ানো, শাড়ির খানিকটা অংশও চোখে পড়ছে। বুঝতে অসুবিধা হল না, কে। আমার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললাম, 'গাড়ির তলা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, এবার সামনে এস।'

সঙ্গে সঙ্গে পা নড়ে উঠল। টুকু গাড়ির পাশ দিয়ে সামনে এসে

দাঁড়াল। সারা গা ভেজা। মাথার চুল ভেজা, মুখে কপালে পড়েছে। ওর মুখে আবার সেই হাসি ফিরে এসেছে। ঠোঁটের কোণে চোখের গভীরে যেন দূর সমুদ্র পারেরই কি এক ইশারা। ভেজা পাতলা শাড়ির মধ্যে ওর সমস্ত শরীরটা যেন রৌদ্রের আলোয় বেরিয়ে এসেছে। বিশ্বের সাত সমুদ্র তের নদীর পারে, বহু সুন্দরী যুবতীর প্রায় নগ্ন দেহও দেখেছি কিন্তু এমন করে বুকের রক্তে দোলা লাগেনি। আসলে এই দোলাটা যৌবন দেখে নয়। যৌবনের সঙ্গে ওই কালো আয়ত চোখের তারায় যেন কী আছে। ও ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'এসে পড়েছি।'

আমি হেসে বললাম, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। চান হয়ে গেল?' টুকু গাড়ির মাডগার্ডের সামনে দাঁড়িয়েই একটু যেন ঠোঁট ফোলাবার ভঙ্গি করল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'চান না আর কিছু। অলকদাটা ভারি পাজী, আমাকে টেনে জলে নামিয়ে অনেকখানি নিয়ে গেছিল।'

সে দৃশ্য আমি দেখেছি। সে কথা ওকে বললাম না। বললাম, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, মা পর্যন্ত হাসছিল। আমার খুব রাগ হয়ে গেছে। আপনি চান করবেন না?'

'এইবার করে নেব।' আমি বই বন্ধ করে গাড়ির মধ্যে রেখে দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল খুকুদের দেখা পেয়েছিলে?'

টুকু মাথা নেড়ে বলল, 'না। ওরা কোথায় বসে নাকি কফি খাচ্ছিল। আমি একলা একলাই বেড়িয়েছি।'

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন তোমার মন ভাল হয়েছে তো?'

টুকু চোখ একটু বড় করে বলল, 'আমার আবার মন খারাপ হল কখন?'

'কাল যেন মনে হল, আমার সঙ্গে বেড়িয়ে ফিরতে ফিরতে, তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে।'

টুকু হেসে বলল, 'ও কিছু নয়।' তারপর আবদারের সুরে বলল,

'চলুন না চান করতে। আমি আপনার হাত ধরে একটু জলে নামব।'

কেন? সমুদ্রের এই নিরালা তীরে টুকু কেন আমাকে এ আমন্ত্রণ করছে। নিয়তির এ কী খেলা। টুকু কি আমাকে সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে? মনের এ ধরনের শক্তি পরীক্ষার জন্য আমি কখনো প্রস্তুত ছিলাম না। আমি সবখানে অনায়াসে ছিলাম। আজ আমার নিজেকে নিয়ে একি দুর্দৈব। আমি হেসে বললাম, 'অলককে ভয় করেছে, আমাকে ভয় করবে না?'

টুকু বলল, 'অলকদা কি আপনার মত সাঁতার জানে? ওকে আমার ভয় করে, আপনাকে আমার ভয় করে না।'

তবু আমি হাসতে হাসতেই বললাম, 'যদি ডুবে যাও?'

টুকু আমার বুকের দিকে তাকিয়ে নির্ভয়ে বলল, 'ইস্, আপনি ধরে থাকলে আমি কখনো ডুবব না।'

বুঝতে পারছি ওকে নিরস্ত করা যাবে না। কিন্তু আমার ভিতরে একটা ভয়। টুকু যেমন অনায়াসে বলতে পারল আমি কি তেমনি অনায়াসে পারব। এ কি আমার পাপবোধ? জীবনের এই গড়িয়ে যাওয়া দুপুরে এই বোধ আমার কোথায় লুকিয়ে ছিল। টুকু আমার কাছে এসে বলল, 'চলুন।'

জলের দিকে এগিয়ে গেলাম। পায়ে এসে ছোট ঢেউ লাগতেই টুকু আমার একটা হাত শক্ত করে ধরল। আমি সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গেলাম, ও আমার অনুকরণে পা তুলে তুলে চলল। ঢেউ এসে ধাক্কা দিয়ে চলে যাবার সময় ওর হাত শক্ত হল। একটু বেশি জলে যেতেই ও দু'হাত দিয়ে আমার হাত ধরল। আমি বললাম, 'ঢেউ এলে ভয় পেও না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেক না। হয় ডুব দিও, নয়তো ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে থেক।'

বলে ওকে আমি দেখিয়ে দিতে লাগলাম। কিন্তু ডুবে থাকা ওর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। অতএব ওকে নিয়েই ঢেউয়ের বুকে লাফ দিয়ে ভেসে থাকবার চেষ্টা করলাম। অসম্ভব। টুকু বড় ঢেউয়ে

pathagar.net

ভাসতে গেলেই চিৎকার করে চোখ বড় করে আমার একেবারে গলা জড়িয়ে ধরছে। ঢেউ নেমে যাবার সময় মাটিতে পা রাখতে পারছে না। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে আমার গায়ের সঙ্গে লগ্ন হয়ে থাকছে। কিন্তু কেমন করে কাকে বোঝাব, আমার এতদিনের শক্ত পাড়ের মাটিতে ফাটল ধরছে, ভাঙছে, ধস্ নামতে চাইছে। ওর গা থেকে শাড়ি প্রায় খুলে গিয়েছে, কোমরে জড়িয়েছে। কাচুলির মত কেবল ছোট একটি জামা যেন গা থেকে খুলে পড়তে চাইছে। জলের বুকে দাঁড়িয়ে আমি দাবানলে পুড়ছি। এ পোড়ার কথা আমার শরীর কখনো জানত না। কিন্তু আমি অনীশ মিত্র, আমার শিক্ষা রুচি, এতদিনের নানা চর্চায় তৈরি মন, কোন রকমেই বিসর্জন দিতে পারি না।

টুকুর চুলে ঢেকে যাওয়া মুখে, চুলের ফাঁকে ফাঁকে চোখ দেখতে পাচ্ছি। জলকে ওর ভয় আছে, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে নিশ্চিন্ত হাসিও আছে। সমগ্র শরীর দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। জলের নিচে পা দিয়ে আমাকে আঁকড়াচ্ছে। তথাপি ওর চোখে যে কোন বিকার আছে আমি তা দেখতে পাচ্ছি না। ও যেন উদাসীন। পাপবোধ আমারই মধ্যে।

এক সময়ে টুকু বলল, 'আর না, আমি হাঁপিয়ে পড়েছি। পাড়ে উঠব।'

ওকে নিয়ে আমি পাড়ের দিকে উঠলাম। ও আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেই রইল। এ দৃশ্য যদি সর্বাণীরা দেখত, কী ভাবত কে জানে!

টুকু বলল, 'দেখলেন তো, মোটেই ডুবলাম না। উহ্, সমুদ্রের এত দূরে আমি কোনদিন যাইনি।'

বলে যেন খুশি আর আনন্দেই আমার ডানায় ওর গাল চেপে ধরল। আর আমার মনে হচ্ছে, শক্তি দাও শক্তি দাও বলে চিৎকার করি। ও কাপড় গায়ে জড়াল না। কাচুলি টেনে ঠিক করছে না। চোখ ফিরিয়ে নিতে চাইলেও, চোখ আমার শাসন মানছে না।

প্রায় জলের সীমার বাইরে চলে আসতে ও আমাকে ছাড়ল, আর ঠিক সে সময়েই চিৎকার শোনা গেল, 'ওই যে, ওই যে।'

তাকিয়ে দেখি, প্রদীপ অলক খুকু, তিনজনেই এদিকে আসছে। খুকু চুস্ত পায়জামার উপরে জামা পরেছে, শরীর জলে ভেজা। প্রদীপ আর অলক হাফ প্যান্ট পরে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, সবাই জল থেকে ভেজা গায়ে উঠে এসেছে। অলকই আগে দৌড়তে দৌড়তে এল। টুকু শক্ত করে আবার আমার হাত চেপে ধরল।

অলক চিৎকার করে উঠল, 'পালিয়ে আসা হয়েছে। এবার কোথায় যাবে?'

টুকু বলে উঠল, 'খবরদার অলকদা, তুমি আমাকে ধরবে না বলছি। আমি অনীশদার সঙ্গে অনেক দূরে গিয়ে চান করেছি।'

অলক আমার দিকে দেখে হেসে বলল, 'তবে আমাদের সঙ্গে গেলে না কেন? চল, এখন যেতে হবে।'

প্রদীপ আর খুকুও কাছে এসে পড়ল। টুকু বলল, 'কাঁচকলা যাব। তুমি সাঁতার জানো না, তার উপরে বীয়ার খেয়েছ।'

আমি প্রায় চমকেই উঠলাম। প্রদীপ চকিতে একবার আমার দিকে দেখে বলে উঠল, 'এই টুকু, কী বাজে কথা বলছিস।'

টুকু চোখ পাকিয়ে বলল, 'বাজে কথা! তুমি আর অলকদা বীয়ার খাওনি? অলকদা আবার আমাকেও খাবার জন্য পেড়াপিড়ি করছিল।'

অলক আর প্রদীপ আমার দিকে চেয়ে একটু অপ্রস্তুত ভাবে হাসল। দেখলাম ওদের চোখ লাল। সেটা বেশিক্ষণ জলে ডুবলেও হতে পারে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, এরা নিশ্চয় কলেজে পড়ে বা ইউনিভারসিটিতে। বীয়র পান করে ভাবতে পারিনি। টুকুই আবার বলল, 'তোমাদের সঙ্গে আমার চান করতে বড় ভয় করে। আমার হয়ে গেছে, আমি আর চান করব না।'

প্রদীপ বলল, 'ঠিক আছে আর চান করতে হবে না। মা

boiRboi.net

আমাদের দেখতে বলল, তুই কোথায় গেছিস। আমরা সেজন্য এসেছি। এখন চল।'

টুকু এবার কোমর থেকে কাপড় খুলে গায়ে জড়াতে জড়াতে বলল, 'তোমরা আগে চল, আমি পেছনে পেছনে 'যাচ্ছি।'

অলক বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ও আর প্রদীপ আগে চলতে আরম্ভ করল। খানিকটা যাবার পরে টুকু খুকুর হাত ধরে আমার দিকে ফিরে বলল, 'যাচ্ছি।'

আমি ঘাড় নাড়লাম। খুকু আমার দিকে চেয়ে একবার হাসল। দু'বোন এগিয়ে গেল। আমি সমুদ্রের দিকে মুখ করে জলের দিকে পা বাড়ালাম কিন্তু সাঁতার এবং অবগাহনের যে আনন্দের জন্য আমি উন্মুখ হয়ে থাকি, এখন আর তা নেই। আমার শরীরে মনে যেন একটা অবসাদ, অথবা শরীরে যেন একটা তীর বেঁধা আড়ষ্টতা। হাঁটু পরিমাণ জলে গিয়ে আমি গা ডুবিয়ে বসে পড়লাম। মনে হল আর বোধ হয় আমার দীঘায় থাকা উচিত না। অথচ হিসাব মত আমার এখনও পাঁচ ছ'দিন থাকার কথা।

তারপর হঠাৎ আমার ভুরু কুঁচকে উঠল। অলক আর প্রদীপের বীয়র পান করার কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। শুধু তা-ই না। টুকুকেও ওরা পান করতে বলেছিল। বিশ বাইশ বয়সের ছেলেরা খেতে পারে না, আমি মনে করি না। কোন কুসংস্কারও নেই। আমার ছোট ভাই মনীশ পান করে থাকে। কিন্তু অলক প্রদীপের ব্যাপারটা আমাদের দেশে কতটা প্রচলিত, কোন ধারণা নেই। বিদেশে এটা কোন ঘটনাই না। তথাপি আমি যেন স্বস্তি বোধ করছি না। সেই যাকে বলে ব্যাকগ্রাউণ্ড, এদের সেটা আমি এখনো কিছুই বুঝতে পারছি না। টুকুর মা-ও কি জানেন, তাঁর ছেলে বীয়র পান করেছে? কত বীয়র পান করেছে ওরা। টুকু যে ভাবে বলল, যেন ওরা বীয়র পান করে বেহিসেবি মেতে গিয়েছে। যদিও, এ ব্যাপারে ওর কথার মধ্যে যেন কোন জড়তাই ছিল না।

কিন্তু কী হবে আমার এসব কথা ভেবে। এদেশে কত রকমের

পরিবার আছে, কত রকম তাদের পরিবেশ, ভাবনা চিন্তা। সে-সব ভেবে আমার কী লাভ। তথাপি, নিজেকে যে ফাঁকিটা দিতে পারছি না, তা হল টুকু আমাকে ভাবাচ্ছে। যে-ভাবনাটা আমি এতদিনের জীবনে কখনও ভাবিনি। গতকাল ভেবেছিলাম, আমার মধ্যে কবিতার জন্ম হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে, কবিতার জন্ম হচ্ছে না, আমার মধ্যে এক অচেনা অনীশ মিত্রের জন্ম হচ্ছে। তা শুভ কি অশুভ জানি না, কোন মঙ্গলের ছায়া যেন দেখতে পাচ্ছি না।

আমি আমার কলকাতার পরিবেশে ফিরে গেলেই এসব ভুলে যাব। সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এসব হল সমুদ্রপারের মায়া। আমি হেসে উঠে দাঁড়ালাম। আজ দুপুরেই বিশ্রামের সময় স্থির করা যাবে, থাকব না যাব। আমি গভীর জলের দিকে গেলাম।

বিকালের ছায়া নামতে এখনো দেরি। আমার ঘরের জানালা দিয়ে রৌদ্রচকিত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আমি যেন একটা মুক্তির স্বাদ বোধ করছি। হেসে মনে মনে বললাম, নিজেকে নিজে এতখানি বিড়ম্বিত করে তোলার কোন কারণ ঘটেনি, যেন একটি অশুভ ছায়ার তাড়নায় আমাকে এই সমুদ্র উপকূল থেকে পালিয়ে যেতে হবে। টুকু একটি নিষ্পাপ মেয়ে, বলতে গেলে কিশোরী, কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ও ওর স্বভাব চপলতায় সহজ ভাবে আমার সঙ্গে মিশেছে। অন্ধকার যদি কোথাও ছায়া ফেলে থাকে তবে তা আমারই মনে। তার জন্য পালানোটা অপরাধ। নিজের সঙ্গে সংগ্রাম করাটাই শ্রেয়। এটা আমার একার ব্যাপার। এর সঙ্গে টুকু জড়িত নেই, ও নিমিত্ত মাত্র। ও যদি একটি চতুর কৌশলপরায়ণা যুবতী হত, তাহলে আমার দুশ্চিন্তা করার কিছু থাকত। এ ক্ষেত্রে তা নেই। এমন একটি নিষ্পাপ ফুলের মত মেয়ের ভয়ে আমি

অনীশ মিত্র পলাতক হতে পারি না। এই মুহূর্তে আমি আমার ভিতরে কোন অন্যায়বোধ দ্বারা পীড়িত হচ্ছি না।

সমুদ্রের এই অশেষ অসীমকে দেখে নিজের ক্ষুদ্রতাকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করছি। এ কিছুই না। যদিও স্বীকার না করে পারছি না, কবি অনীশ মিত্রের জীবনে একটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল। নিজেকে তার এতটা চেনা ছিল না। মানুষ অনেক রহস্যকে আবিষ্কার করে, অথচ মানুষ নিজের কাছেই একটি দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

মনে হল নিচে যেন কারা কথা বলছে। ভৃত্যেরাই হবে। আমি টেবিলের কাছে গিয়ে ঘড়ি দেখলাম। সাড়ে তিনটে বেজেছে। আজ আর গাড়ি নিয়ে বেরোব না, হাঁটব। একটা সিগারেট ধরাবার জন্য ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরাতে যাব, পর্দা সরিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিল টুকু। আমি সিগারেট ধরিয়ে মুখ গম্ভীর করে বললাম, 'সারাদিন টো টো করে বেড়ানো হচ্ছে বুঝি?'

টুকু ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল, 'মোটেই না। ঘরেই ছিলাম, ভাল লাগছিল না, তাই আপনার এখানে চলে এলাম।'

'হুম্, কিন্তু ঘরে উঁকি দেবার আগে দরজায় শব্দ করতে হয়, তা-ও জানো না?'

টুকুর মুখে চকিত ছায়া পড়ল, ভয় ভয় স্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'রাগ করেছেন?'

মনে মনে হাসলেও গম্ভীর ভাবেই বললাম, 'করেছি তো। করব না?'

টুকু একটু অপরাধীর ভাবে বলল, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি?'

সত্যি ছেলেমানুষ। আমি হেসে বললাম, 'এস বস, আমি রাগ করিনি। এমনি এমনিই বললাম।'

তবু টুকুর মুখে হাসিটি তেমন করে ফুটল না। বলল, 'কথাটা সত্যি আমার মনে আসেনি। আমি এখন তাহলে যাই, পরে দেখা করব'

আমি এবার শব্দ করে হেসে বললাম, 'এই দেখ, কী বোকা মেয়ে। বলছি আমি মোটেই রাগ করিনি। বস, চা করতে বলি, তোমার সঙ্গে গল্প করি।'

টুকু তবু আমার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। বোধ হয় অভিমান হয়েছে। ও আজ তেমন কোন সাজগোজ করেনি। চোখে ঠোঁটে রঙ মাখেনি। মুখেও না। তবে সবুজ পাড় বাসন্তী রঙের শাড়ি নাভির নিচেই পরেছে। জামাটিও পেটের ওপরে, স্লিভলেস। আমি ঘরের বাইরে যাওয়ার আগে ওর চুল খোলা মাথায় হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললাম, 'লক্ষ্মী মেয়ের মত বস।'

বাইরে গিয়ে ভৃত্যকে ডেকে চা দিতে বললাম। অবিশ্যি চায়ের সময় প্রায় হয়েই গিয়েছে। ঘরে ঢুকে দেখি টুকু জানালায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছে। বলল, 'আপনার ঘর থেকে টুরিস্ট লজের থেকেও সমুদ্র যেন আরো কাছে মনে হয়।'

বললাম, 'সমুদ্র যে আমাকে ভালবাসে।'

টুকু বেশ বুদ্ধিমতীর মত বলল, 'আর সমুদ্র আমাকে খালি ভয় দেখায়।'

আমি বললাম, 'দেখাবেই তো। তুমি সমুদ্রের কাছে যেতে চাও না কেন?

টুকু বলল, 'বা রে, আমি যে সাঁতার জানি না।'

'ভালবাসা পেতে হলে জানতে হবে।'

'তাহলে আপনি শিখিয়ে দেবেন।'

ওর কথা শুনে হেসে ফেললাম। টুকুর মুখেও এখন হাসি। বললাম, 'দুদিনেই আর সাঁতার শিখিয়ে দেওয়া যায় না। কলকাতায় তো অনেক ব্যবস্থা। তুমি তো লেকে গিয়ে শিখতে পারো।'

টুকু ঠোঁট ওলটাল। বলল, 'তাহলেই হয়েছে। আমার দ্বারা ওসব কিচ্ছু হবে না। আমি শেষ পর্যন্ত একটা বাজে মেয়ে হয়ে যাব।'

আমি ভ্রূকুটি করে বললাম, 'ও আবার কেমন কথা?'

টুকুর মুখে এখন আর হাসি নেই। বলল, 'সত্যি দেখবেন, আমার কিছু হবে না। লেখাপড়া হবে না, গান বাজনা শেখা হবে না, কিচ্ছু না।'

আমি প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলাম, 'কেন কেন, এসব কথা বলছ কেন?'

টুকু আমার দিকে চেয়ে একটু ম্লান হাসল। বলল, 'এমনি।'

'এমনিও ওসব কথা বলতে নেই, ভাবতে নেই। তোমার দ্বারা সব হতে পারে।'

'কী করে জানলেন?'

'তুমি লেখাপড়ায় কেমন আমি অবিশ্যি জানি না।'

'খুব খারাপ, থার্ড ডিভিশনে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করেছি।'

'তা হোক। আমি তোমার গান শুনেছি, তোমার গলা বেশ মিষ্টি, গলায় ভাল কাজ আছে। তোমার তো তালজ্ঞানও আছে দেখেছি। তা ছাড়া, তুমি ইচ্ছে করলে ভাল নাচও শিখতে পারো। তুমি কি নিয়মিত গান শেখ?'

টুকু নিরুৎসাহ সুরে বলল, 'শিখি, তবে না শেখারই মত। বাড়িতে তো সারাদিন আড্ডা গল্প হৈ চৈ নাচ গান লেগেই আছে।'

হৈ চৈ নাচ গান বলতে কী বোঝাতে চাইছে টুকু, অনুমান করতে পারছি। নাচ গান মানে, গতকাল সমুদ্রের ধারে যে সব নাচ গান হয়েছিল। একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাবা মা কিছু বলেন না?'

টুকু বলল, 'বাবার কথা তো বাদ। বাবা আর কতক্ষণ বাড়িতে থাকে। নিজের তালেই ঘুরে বেড়ায়, খালি বিজনেস আর পলিটিক্স। দেখলে শুনলে মনে হয়, আমরা বুঝি বড়লোক। তাও না। আর মা? মা-ও তো সারাদিন হৈ চৈ নিয়েই থাকে।'

এই অকপট কথাগুলো, আমার চোখের সামনে যেন একটা ছবি তুলে ধরছে। যদিও টুকুর মায়ের ব্যাপারটা আমি সঠিক কিছু

অনুমান করে উঠতে পারছি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার দাদা এখন কি পড়ে?'

টুকু বলল, 'ছাই। টুকে টুকেও কোনদিন পার্ট ওয়ান পাশ করতে পারেনি, এখন তো কেবল মস্তানি করে বেড়ায়।'

নিজের বাবা দাদা মায়ের সম্পর্কে এত স্পষ্ট কথা শুনে আমি নিজেই যেন বিব্রত হয়ে পড়ছি। বলে উঠলাম, 'না না, মস্তানি আবার কী কথা। তোমার দাদাকে দেখে তো বেশ ভদ্র মনে হল।'

টুকু ঠোঁট উল্‌টে বলল, 'আপনি ওসব জানেন না। বাইরে থেকে অনেককেই ওরকম ভদ্র মনে হয়। আমার দাদাকে আমি চিনি না? বাবা তো ওকে কতদিন বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেছে। ও বাবাকে একটুও মানে না।'

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন এল, জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার দাদার বন্ধু অলক কেমন?'

টুকু বলল, 'ওরা সব এক। অলকদা বড়লোকের ছেলে, এই যা। দাদাও সেই জন্য ওর সঙ্গে মেশে, একসঙ্গে জুয়ো খেলে।'

'জুয়ো?' আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই।

টুকু বলল, 'হ্যাঁ, ওরা রোজ জুয়ো খেলে। আমাদের বাড়িতেও খেলা হয়। এখানেও মা কাকা অলকদারা রোজ খেলে। আমিও একটু আধটু খেলি।'

আমি বললাম, 'ওটাকে জুয়ো খেলা বলে না। বাড়িতে ওরকম একটু আধটু খেলা হয়েই থাকে।'

টুকু ঘাড় নেড়ে বলল, 'না অনীশদা, আপনি জানেন না, ওরা বোর্ড মানি দিয়ে রিয়েল জুয়ো খেলে। ওটা ওদের নেশা।'

আমি হতবাক হয়ে যাই। টুকু আর ওর চারপাশের চেহারাটা যেন আমার কাছে আমূল বদলে যেতে থাকে। তথাপি সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্বাস করে নিতে যেন আমার অস্বস্তি হচ্ছে। ভৃত্য চায়ের ট্রে রেখে চলে গেল।

টুকু টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি চা ঢেলে দেব?'

boiRboi.net

বললাম, 'দাও।'

টুকু চা ঢালছে, আমি ওকেই দেখছি। ভাবছি, এত অল্প পরিচয়ের মধ্যেই নিজেদের পরিবার সম্পর্কে আমাকে এতগুলো কথা বলল কেন। নিতান্ত সরল হলেও সহসা এ ধরনের কথা কেউ বলতে চায় না। বুঝতে পারি না, পারিবারিক যে পরিবেশের কথা টুকু বলল, সেখানে ওর জীবনটা কী রকম কাটে। ওকে আমার এমনিতে অসুখী মেয়ে মনে হয়নি। কিন্তু গতকাল রাত্রে বেড়িয়ে ফেরবার সময় ওকে অন্যরকম দেখেছিলাম।

ওর মা কেমন? কাকা লোকটিই বা কেমন? যদিও এসব কথা টুকুকে আমি কিছুতেই জিজ্ঞেস করতে পারব না। অথচ গতকাল যখন সমুদ্রের ধারে ওর মাকে দেখেছিলাম, মনে হয়েছিল মোটামুটি একজন সুখী মহিলা তাঁর সন্তানদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এসেছেন। এখন যেন সেই ছবিটা আর মন মেনে নিতে চাইছে না। টুকু কি খুব দুঃখী? ও কি একটি অসহায় মেয়ে? যার বাবার প্রতি তেমন টান নেই। মায়ের সম্পর্কে মনোভাব পরিচ্ছন্ন না। দাদার সম্পর্কে কোন ভাল ধারণাই নেই।

টুকু আমার দিকে এক কাপ চা বাড়িয়ে দিল। হাত বাড়িয়ে নিতে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হল। ও একটু হাসল, হাসিতে একটু সলজ্জ ভাব। ফিরে গিয়ে আবার নিজের জন্য চা ঢালল। তারপর চায়ের কাপ নিয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল। আমি বললাম, 'বস।'

টুকু বসল। আমার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে একটু হাসল, আবার জিজ্ঞেস করল, 'আজ কখন বেরোবেন?'

'একটু বাদেই বেরোব।'

'কোথায় যাবেন?'

'কোথায় আর, সমুদ্রের ধারে একটু হেঁটে বেড়াব ভাবছি।'

টুকু আমার দিকে তাকাল, আবার চোখ নামিয়ে নিল। ওর ঠোঁটে টেপা হাসি। কিছু বলতে চায় বোধ হয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু বলছ টুকু?'

টুকু বলল, 'কোথাও বেড়াতে যাবেন ?'

'এখানে আর কোথায় যাব, সমুদ্রের ধার ছাড়া ?'

'না, সমুদ্রের ধারে না, অন্য কোথাও, অনেকটা দূরে।'

এখানে অনেক দূরে, এই পড়ন্ত বেলায়, কোথায় যাওয়া যায়, আমার কোন ধারণা নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় যেতে চাও ?'

'তা আমি জানি না। ইচ্ছে হচ্ছে কোথাও একটু বেড়িয়ে আসি।'

আমি খানিকটা ভেবে বললাম, 'কণ্টাই শহর থেকে ঘুরে আসা যায়।'

টুকু খুশি হয়ে বলল, 'তা-ই চলুন।'

আমি ঘড়ি দেখলাম। চারটে বেজে দশ মিনিট। যেতে আসতে দু'ঘণ্টা, আড়াই ঘণ্টা। শহরটা যদিও নোঙরা, দেখবার কিছুই নেই, তবুও ধরে নেওয়া যেতে পারে সর্বসাকুল্যে তিন সাড়ে তিনঘণ্টার ব্যাপার। বললাম, 'তা হলে আর দেরি নয়, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে হয়।'

টুকু চোঁ করে চুমুক দিয়ে চা খেয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, 'চলুন।'

আমি হেসে বললাম, 'বস, আমাকে জামাকাপড় বদলাতে দাও।'

ও বলল, 'আমি তার মধ্যে মাকে একটু বলে আসি।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার মা রাগ করবেন না তো ?'

'রাগ ?' টুকু যেন বিদ্রূপ করে উঠতে চাইল। বলল, 'নেহাৎ দেখতে না পেলে খোঁজাখুঁজি করবে তাই খবর দিচ্ছি। আমি আসছি।' বলে ও বেরিয়ে গেল।

আমি পোশাক বদলাতে বদলাতে ভাবলাম, ঠিক এ রকম একটি পরিবারের মেয়ের সঙ্গে আমার কখনো পরিচয় হয়নি। এ রকম পরিবারকে আমি চিনি না, বুঝি না। এরকম মেয়েকে নিয়ে আমি কোনদিন বেড়াতেও বেরোইনি। ঘটনা পরম্পরা বড় অদ্ভুত। কিন্তু আমার মন এখনও পরিষ্কার। আমি নিচে নেমে পেট্রলের টিন বের করতে বললাম। ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নিয়ে তৈরি হবার

আগেই টুকু চলে এল।

ও মাথায় একটা সিল্‌কের ছাপানো রঙিন রুমাল বেঁধে এসেছে। বলল, 'বাতাসে বড্ড চুল ওড়ে, সেজন্য এটা বেঁধে এলাম।'

বললাম, 'খুকুকে নিয়ে এলে না কেন?'

'ওরা তিনজনে বেরিয়ে গেছে। আমি মাকে বলে চলে এলাম।'

বলে ও গাড়িতে উঠল। আমি উঠে গাড়ি স্টার্ট করলাম। টুকু বলল, 'আমার খুব ড্রাইভিং শিখতে ইচ্ছে করে।'

'কাকার গাড়ি নিয়ে শিখলেই পারো।'

'কাকার গাড়ি পাব কোথায়। কাকা তো থাকে শিবপুরে। আমার আপন কাকা তো নয়। বাবার দূর সম্পর্কের ভাই। আমাদের কোন গাড়ি নেই।'

সমস্ত ব্যাপারটাই খুব অদ্ভুত লাগছে। অবিশ্যি তা লাগবারও তেমন কোন কারণ নেই। দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে বেড়াতে বেরোনো যায়। কিন্তু আমি বলতে পারি না টুকুকে ড্রাইভিং শেখাব। কোন দিনই আমার সে সময় হবে না। সামনে তাকিয়ে গাড়ি চালালেও বুঝতে পারছি, টুকু আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি ওর দিকে তাকালাম। দেখলাম, ও মুখ টিপে হাসছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হল?'

টুকু বলল, 'আমার খুব মজা লাগছে।'

'কিসের মজা?'

'কেমন বেরিয়ে পড়লাম!'

ছেলেমানুষের আনন্দ। আমারও খারাপ লাগছে না। এখানে বেড়াতে এসে, অলস ভাবে সমুদ্রের ধারে বেড়াতেই ভাল লাগে। এ রকম হঠাৎ একটু বেরিয়ে পড়তেও মন্দ লাগে না। একটু নতুনত্ব লাগছে।

কণ্টাই শহরে যখন আমরা ঢুকলাম, তখন দিনের আলো সামান্যই আছে। ঘিঞ্জি শহর, সরু রাস্তা। বড় গাড়ি নিয়ে আমাকে সাবধানেই চলতে হচ্ছে। টুকু চারদিকে তাকিয়ে দেখছে। একটা সিনেমা হলে কী একটা হিন্দী ছবি হচ্ছে। টুকু বলে উঠল, 'এ ছবিটা এখন এখানে হচ্ছে? কলকাতায় আমরা কবে দেখেছি।'

'তুমি বুঝি খুব ছবি দেখ?'

'খুব। আমি একটা ছবিও ছাড়ি না। আপনি দেখেন না?'

সত্যি, অবাক কাণ্ড, আমি ছবি প্রায় দেখিই না। শেষ কবে ছবি দেখেছি, তাও মনে করতে পারছি না। আর টুকু একটা ছবিও নাকি বাদ দেয় না। বললাম, 'আমি যে শেষ কবে সিনেমা দেখেছি, মনে করতে পারছি না।'

'সে কি, আপনি সিনেমা দেখেনই না?'

'প্রায় তাই, কোন রকম আকর্ষণ বোধ করি না। তা তুমি যে এত ছবি দেখ, পড়াশুনা কর কখন?'

টুকু ঠোঁট উল্‌টে বলল, 'ওর মধ্যেই সময় করে নিই। কিন্তু আমি ছবি না দেখে পারি না। আমি, মা আর খুকু তো দেখিই, তাছাড়া বন্ধুদের সঙ্গেও যাই।'

যত শুনছি, ততই মনে হচ্ছে, টুকুর জীবনটা যেন কেমন ছন্নছাড়া। ওদের পরিবারটিরও। সব মিলিয়ে কেমন যেন এক নীতি-শৃঙ্খলাহীন। কী রকম জীবন যাপনে ওরা অভ্যস্ত, বুঝি না। শুধু এটাই বুঝছি, টুকু ওদের পরিবারে সুখী নয়, মনে অভিযোগ আছে অথচ প্রতিবাদ নেই, সব কিছুর মধ্যে ও নিজেও জড়িয়ে আছে।

শহরের এদিকে ওদিকে ঘুরতেই অন্ধকার নেমে এল। চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। বললাম, 'এবার ফেরা যাক টুকু।'

টুকু বলল, 'এখনি?'

'এখানে আর কী দেখবে? এই সব দোকান পাট?' বলে আমি হাসলাম।

boiRboi.net

'এখানে কিছুই নেই ?'

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। এ শহরের কোন এক অংশে, দিনের বেলা আমি কপালকুণ্ডলা কালীমূর্তি দর্শন করেছিলাম। একটি সাদা পাথরের ফলকে লেখা আছে, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ সালে সেই কপালকুণ্ডলা কালীমূর্তি দর্শন করেছিলেন। সেই সময়ে সেখানে জঙ্গল ছিল এবং সমুদ্র কাছে ছিল। তার প্রমাণস্বরূপ দেখেছিলাম, মন্দির অঞ্চলের আশপাশে জমি সমস্তই প্রায় বালুকাময়। কিন্তু এখন আমি এই অন্ধকারে সেই মন্দিরের রাস্তা চিনতে পারব না। তবু বললাম, 'এখানে দেখবার মত একটি জিনিসই আমার জানা আছে। তা হল কপালকুণ্ডলা কালীমূর্তি। কিন্তু—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই টুকু বলে উঠল, 'অনীশদা, দেখতে যাব।'

হেসে বললাম, 'তা তো যাবে, কিন্তু কথা হচ্ছে, আমি সেখানে দিনের বেলা গিয়েছিলাম। রাত্রের অন্ধকারে সে পথ আমি চিনতে পারব না।'

টুকু বলল, 'লোকজনকে জিজ্ঞেস করে নিন না, তারা ঠিক বলে দেবে।'

টুকুর উৎসাহ এবং উৎসুক চোখের দিকে তাকিয়ে অরাজী হতে পারলাম না। ওর কথামত লোকজনকে জিজ্ঞেস করে শহরের ভিতর দিয়ে অন্য প্রান্তে এগিয়ে চললাম। এক সময় মনে হল যেন শহরের বাইরে চলে এসেছি। রাস্তায় কোন আলো নেই, একমাত্র ছোটখাটো দু-একটা দোকানে টিমটিম হ্যারিকেন ছাড়া। সরু রাস্তাটা যদিও পীচ ঢালা, কিন্তু ভাঙাচোরা। আমি হেড লাইট জ্বালিয়ে চলতে লাগলাম। এক জায়গায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে আর একজনকে জিজ্ঞেস করতেই সে বলল, বাঁদিকেই সেই মন্দির।

আমি গাড়ি দাঁড় করিয়ে কাঁচ তুলে দিলাম। টুকু নেমে দাঁড়াল। আমি হেডলাইট নিভিয়ে দিতেই গভীর অন্ধকার যেন গ্রাস করে

নিল। পাচারিদের পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। আমি গাড়ির দরজা বন্ধ করে ওপাশে গেলাম। টুকু আমার গায়ের কাছ ঘেঁষে বলল, 'অনীশদা, ভীষণ অন্ধকার।'

বললাম, 'হ্যাঁ, সাবধানে এস।'

ও বলল, 'এত অন্ধকারে লোক থাকে কেমন করে?'

বললাম, 'গ্রামের মানুষেরা এরকম অন্ধকারেই থাকে। এস।'

রাস্তার বাইরে পা বাড়াতেই বালির ওপরে পড়লাম। টুকু আমার হাত চেপে ধরল, বলল, 'কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'সাবধানে এস।'

সামনে কয়েকটা গাছপালা রয়েছে। যেন মনে হচ্ছে, অন্ধকারে গভীর জঙ্গলে চলে এসেছি। সমুদ্রের কল গর্জন শোনা যাচ্ছে নাকি? কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের বর্ণনা মনে পড়তে লাগল। টুকু এবার অনায়াসে আমার কোমরের কাছে জড়িয়ে ধরল। আমার মধ্যে আবার সেই অনুভূতি ফিরে এল। আমার যেন নিশ্বাস পড়ছে না। টুকুর শরীরের স্পর্শ বড় তীব্র হয়ে যেন বাজছে। বাজছে আমার রক্তের তরঙ্গে। যেন অলৌকিক কিছু ঘটছে। এই টুকু কে? এখন মনে হচ্ছে, এক নারী আমাকে আলিঙ্গন করে আছে। এই নারী 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' জিজ্ঞেস করে না। বরং সে যেন স্তব্ধ স্রোতকে তার পাশে বহিয়ে দেবার জন্য প্রকৃতির মত অন্ধ, অনায়াসে মুখ খুলে দিচ্ছে। আমি ভেসে যাচ্ছি। আমার চারিদিকে গভীর অন্ধকার। পায়ের তলায় বালি। আমি সত্যি সত্যি সমুদ্রের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। তারই সঙ্গে টুকুর গায়ের একটি হালকা মিষ্টি গন্ধ, যা কেবল আমার ঘ্রাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আমার মস্তিষ্কের কোষে কোষে বিদ্ধ হচ্ছে। যাকে বলে 'অবসেশন', আমি যেন তার দ্বারাই আক্রান্ত হচ্ছি। জানি না, এ কোন্ কপালকুণ্ডলা উপকথার নবকুমারের জন্ম হচ্ছে। ভাবি, টুকু কি সত্যি এমন সহজ আর অনায়াস, যে ও ওর দেহকে আমার দেহের সঙ্গে এমন নিবিড় ভাবে সংলগ্ন করেও সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্বিকার। তবে আমার মধ্যে এ

কোন্ মায়ার খেলা, রক্তে কোন তরঙ্গের দোলা!

বাঁদিকে একটি টিমটিমে আলো দেখা গেল। সেই আলোয় দু-একটি ছায়াবৎ মানুষকে দেখা গেল। একটি গাছের নিচে দি আচ্ছন্নের মতই সেদিকে এগিয়ে গেলাম। বালি পেরিয়ে অ. মাটির উঠোনে পা দিতেই সামনে মন্দির দেখতে পেলাম। দি আলোয় দেখার থেকে এই দেখা সম্পূর্ণ আলাদা। বিশেষ করে এ অষ্টাদশী মেয়ে যখন এক হাতে আমার কোমর বেষ্টন করে আছে, দেহের অংশতঃ আমার শরীরের নিবিড় স্পর্শে। এই পরিবেশ এব দেবী কপালকুণ্ডলা, সবই যেন ভিন্নরূপে দেখা দিচ্ছে।

মন্দিরের অভ্যন্তরে কপালকুণ্ডলার অস্পষ্ট মূর্তি দেখা যাচ্ছে সেই দিকে তাকিয়ে এগোতে যাব, একটি নিচু ভাঙাভাঙা পুরুষের স্বর শোনা গেল, 'আসুন বাবা মা, পায়ের জুতো নিচে খুলে রেখে আসুন।'

কথার উচ্চারণ যেন অনেকটা উড়িয়া-ভাষীর মত। সামনেই বারান্দায় ওঠার সিঁড়ি। তারপরে ছোট দালান, দালানের প মন্দির। আমার পায়ে ফিতে বাঁধা জুতো ছিল না এই সুবিধা। এখনো টুকু আমাকে তেমনি ভাবেই ধরে আছে। বারান্দায় উঠে নিচু গলায় বলল, 'আমার কেমন ভয় লাগছে।'

আমার গলার স্বর প্রায় রুদ্ধ, তবু বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। মনে মনে বললাম, 'ভয়ের যদি কিছু থাকে, সে আমার।'

আমরা আধো অন্ধকার দালানে প্রবেশ করলাম। মন্দিরের মধ্যে আলোর তেমন জোর নেই, তবু কপালকুণ্ডলার নগ্ন রক্তবক্ষ মূর্তি প্রায় স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। দেওয়ালের গায়ে খাঁড়া ঝোলানো, তাতে রক্ত মাখা। টুকু একটু যেন ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কপালকুণ্ডলার মূর্তি বুঝি এ রকম?'

জবাব দিল দরজার পাশের মূর্তি, 'হ্যাঁ মা, ইনি দেবী কপাল কুণ্ডলা। বঙ্কিমবাবু যখন এখানে ডিপ্‌টি ম্যাজিস্টর ছিলেন তখন এসেছিলেন, উনি বই লিখেছেন। এই যে দেখুন. দেওয়ালে লেখা আছে।'

ডানদিকের দেওয়ালে সেই সাদা পাথরের ফলক অস্পষ্ট দেখা গেল। টুকু সেই ভাবেই আবার জিজ্ঞেস করল, 'ওই যে খাঁড়া ঝুলছে, ওতে কী লেগে আছে? সত্যি সত্যি রক্ত নাকি?'

লোকটি বলল, 'হ্যাঁ মা, পশুবলির রক্ত এ খাঁড়া থেকে ধোবার নিয়ম নেই।'

টুকু কোন কথা বলল না। ওর আয়ত চোখে যেন একটি ভয়ের ছায়া। তবু আস্তে আস্তে আমার কোমর ছেড়ে ছিল। জানু পেতে বসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল। তখনই উঠল না, সেইভাবে একটু সময় রইল। আর আমি? দেব দেবী সম্পর্কে যার কোন দুর্বলতা বা মোহ নেই, সেই আমার মধ্যে যেন পাপবোধ জেগে উঠছে। কপালকুণ্ডলার রক্তবক্ষ এবং স্থিরবদ্ধ ত্রিনয়নের দিকে যেন তাকাতে পারছি না। মনে মনে বলে উঠলাম, 'ক্ষমা কর, মুক্তি দাও। যা কিছু ঘটছে তা আমার জ্ঞানের অগোচরে। অন্ধ প্রকৃতির কাছে আমি মূঢ়।'

দরজার পাশের লোকটি মন্দিরের মধ্যে গেল। ছোট প্রদীপ বসানো একটি পিতলের থালা তুলে নিয়ে সামনে এল। এক পাশের তৈলাক্ত সিঁদুর আঙুলের ডগায় নিয়ে টুকুর কপালে ফোঁটা দিল। একটি পাথরের বাটি থেকে তামার কোষায় করে চরণামৃত তুলে দিল। টুকু নিয়ে মুখে দিয়ে মাথায় মুছল। লোকটি বলল, 'স্বামী পুত্র নিয়ে সুখে থাকুন মা।'

তারপরে লোকটি আমাকেও চরণামৃত দিল, কিন্তু কপালে সিঁদুর দিল না।

টুকু উঠে আমার পাশে দাঁড়াল। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। আবার ওর চোখে সেই দৃষ্টি, যেন কোন্ বহু দূরে ডেকে নিয়ে যাবার হাতছানি। কিন্তু ঠোঁটের হাসিতে বক্রতা নেই। পর-মুহূর্তেই যেন একটু লজ্জা দেখা দিল ওর হাসিতে, বলল, 'আমি পয়সা নিয়ে বেরোইনি।'

আচ্ছন্নতার মধ্যেও সে-বোধ আমি হারাইনি। টুকুর কথা থেকে

বুঝলাম এখানে কিছু দিতে হবে। আমি হিপ পকেট থেকে পার্স বের করে, জিজ্ঞেস করলাম, 'কত দেবে বল ?'

জবাব দিল লোকটি, 'মাকে দর্শন করে আপনার যা মন চায়, তাই দিন বাবা।'

আমি পার্সের মুখ ফাঁক করে টুকুকে বললাম, 'তোমার যা ইচ্ছে হয় দাও।'

টুকু অসংকোচে পার্সের দিকে চেয়ে হাত দিয়ে দেখে দেখে মাত্র একটি এক টাকার নোট তুলে পিতলের থালায় রেখে দিল। বলল, 'চলুন যাই।'

চলে আসবার আগে কপালকুণ্ডলা দর্শন করতে গিয়ে রক্ত-মাখা খাঁড়ার ওপরে আমার দৃষ্টি পড়ল। বাইরের উঠোন পেরোবার আগেই গাছের নিচেয় অন্ধকারে টুকু আবার আমার কোমর এক হাতে জড়িয়ে ধরল। আমার কানে সমুদ্রের গর্জন বাজছে, অন্ধকারকে গভীর জঙ্গলময় দেখছি। কাপালিকের বজ্রনাদ শুনতে পাচ্ছি, 'কপালকুণ্ডলে! কপালকুণ্ডলে!.....'

টুকু হঠাৎ আমার বুকের কাছে, ওর গলা চেপে একটু হাসির শব্দ করে বলে উঠল, 'আমার ভীষণ লজ্জা করছিল।'

আমার গলায় কি স্বর নেই! আমি যেন বহুদূর থেকে জোর করে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন ?'

টুকু বলল, 'বুঝতে পারলেন না, পুরোহিত ভেবেছে আমি বিবাহিতা, আর আপনি আমার....'

টুকু কথা শেষ করতে পারল না। এই নিবিড় অন্ধকারেও যেন লজ্জা ঢাকবার জন্য ওর মুখ আমার বুকের পাশে আরও গভীর ভাবে চেপে ধরল। যেন মুখ লুকোতে চাইছে। এ ওর কিসের লজ্জা! ছেলেমানুষের ? না কি যুবতীর হৃদয় এবং মন থেকে জেগে ওঠা ? পরমুহূর্তেই আমি যা করলাম, তা আমার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত বিস্ময়কর। আমি প্রায় অট্টহাসি হেসে উঠলাম।

টুকু হঠাৎ আমার সামনের দিকে এসে আমাকে দু-হাতে জড়িয়ে

ধরল, প্রায় ভীরু আর্ত স্বরে উঠল, 'কী হয়েছে অনীশদা, এ রকম করে হাসছেন কেন ?'

বললাম, 'তোমার ছেলেমানুষি আর লোকটার পাগলামি দেখে।'

ও বলল, 'ছেলেমানুষি ? লোকটার কথা শুনলেন না ? দেখলেন না, শুধু আমাকে সিঁদুর পরিয়ে দিল ?'

গম্ভীর গলায় বললাম, 'হ্যাঁ, ও তো একটা পাগল ! দেখি টুকু, তুমি আমাকে ছাড়ো, আমি চলতে পারছি না।'

টুকু তৎক্ষণাৎ আমাকে ছেড়ে দিল। আমি পা বাড়িয়ে ডাকলাম, 'এস।'

আমি নিজেও বুঝতে পারছি না, আমার গলার স্বর পর্যন্ত বদলে গিয়েছে। কয়েক পা এগিয়ে থামলাম। পিছন ফিরে টুকুকে দেখতে পেলাম না। ডাকলাম, 'টুকু !' কোন জবাব পেলাম না। আবার ডাকলাম, 'টুকু !' টুকু কোথায় গেলে ?'

পিছনের অন্ধকার থেকে জবাব এল, 'আপনি গাড়িতে গিয়ে আলো জ্বালুন, তারপরে যাচ্ছি।'

ওর গলার স্বর ঠাণ্ডা, ম্রিয়মাণ। আমি গাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছি। রাস্তায় ছায়া ছায়া দু-একটা মানুষকেও। এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলতেই ভিতরের আলো জ্বলে উঠল। ভিতরে ঢুকে হেডলাইটও জ্বালিয়ে দিলাম। একটু পরেই অন্যদিকে কাঁচের পাশে টুকুকে দেখা গেল। আমি ভিতর থেকে লক খুলে দিলাম। ও ভিতরে ঢুকে জানালার পাশ ঘেঁষে বসল। সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। গাড়ির ভিতরে অন্ধকার। গাড়ি ঘোরাতে একটু বেগ পেতে হল। পিছনে গিয়ে বালির ওপরে উঠে ডানদিকে ঘোরাতে হল।

সমুদ্রের গর্জন, কাপালিকের বজ্রনাদ এখনো যেন আমি শুনতে পাচ্ছি। আমার শরীর থেকে একটি কোমল অথচ আগুনের স্পর্শে এবং মনের আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। কী ঘটছে আমার মধ্যে ? আমার অট্টহাসি, আমার গাম্ভীর্য, সবই যেন আমার পারাজয় বলে মনে হচ্ছে। এখন তো স্পষ্টই বুঝতে পারছি, টুকু আমার

ব্যবহারের আচমকা রূঢ়তা বুঝতে পেরেছে। সেই জন্যই কোন কথা বলছে না। কিন্তু আমিও কেন বলতে পারছি না। এও তো আমার পরাজয়ের সূচনা। আমার ভিতরটাকে কি টুকু দেখতে পাচ্ছে!

শহর ছাড়িয়ে অন্ধকার নির্জন রাস্তায় এসে পড়লাম। তবু কেউ কোন কথা বলছি না। ড্যাশবোর্ডের আলোয় দেখছি, টুকুর মাথার রুমাল ঘাড়ের কাছে খুলে পড়েছে। হঠাৎই ওর গলা শুনতে পেলাম, 'আপনি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করেছেন।'

আমি হেসে উঠে বললাম, 'না না, রাগ করব কেন?'

টুকু বলল, 'আমি জানি করেছেন। কিন্তু আমার কী দোষ। লোকটার কথা শুনে আমার সত্যি সত্যি লজ্জা করছিল তা-ই....।'

টুকুর গলার স্বর হঠাৎ থেমে গেল। হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁটের ওপর চেপে ধরল, মুখ নিচু। আমি গাড়ির গতি কমাতে কমাতে ডাকলাম, 'টুকু!'

জবাব পেলাম না। কিন্তু ড্যাশবোর্ডের আলোয় দেখলাম ওর চোখের কোণে জল উপছে এসেছে। আমি রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে টুকুর পাশে সরে গেলাম। ওর ঠোঁটে চাপা হাতটা টেনে ধরে বললাম, 'এ কি, তুমি কাঁদছ?'

টুকু ফুঁপিয়ে ওঠা স্বরে বলল, 'আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন।'

আমি ওকে একটু কাছে টানবার চেষ্টা করে বললাম, 'সত্যি, রাগ করিনি।'

টুকু কান্নারুদ্ধ গলায় বলল, 'রাগ না করলে আপনি বুঝি ওই অন্ধকারে আমাকে একলা ফেলে চলে যেতেন?'

আহ্, নিজের মিথ্যাকে আমি কী দিয়ে ঢাকব। অথচ টুকুর এই কান্না আমাকে বিচলিত করে তুলছে, একটা ব্যথার আবেগে ব্যাকুল হয়ে পড়ছি। আমি ডেকে উঠলাম, 'টুকু টুকু, শোন টুকু, আমি বুঝতে পারিনি।'

টুকুর কান্না তাতে প্রশমিত হল না। আমার কাঁধের ওপর মুখ রেখে, আমার গলার কাছে কান্নার উষ্ণ ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

জানি না কোন্ অনির্ণেয় নিরুদ্দেশের পথে আমি চলেছি। আমি টুকুর গালে হাত দিলাম। ওকে শান্ত করার জন্য বললাম, 'টুকু চুপ কর।'

টুকু আমার গলার কাছে ওর ঠোঁট চেপে ধরল। আস্তে আস্তে ওর কান্না থেমে এল। আমার চিবুকে ওর গাল ঠেকছে। আমি যেন অন্ধ প্রকৃতির ক্রীড়নক হয়ে উঠলাম, আমার মুখ নেমে এল, আমার গাল টুকুর গালে ঠেকল। টুকু একটা হাত দিয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। মনে হল ও ঘুমিয়ে পড়ছে। আমি ডাকলাম, 'টুকু'—

টুকু শব্দ করল, 'উঁ ?'

'এবার ফেরা যাক চল, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

টুকু আমার কাঁধ থেকে মুখ তুলে আমার মুখের দিকে দেখল। অন্ধকারে অস্পষ্ট ওর মুখ দেখতে পাচ্ছি। ওর চোখ দেখতে পাচ্ছি না। শুনতে পেলাম ও জিজ্ঞেস করছে, 'আর রাগ নেই তো ?'

বললাম, 'আমি রাগ করিনি টুকু।'

'তবে আমাকে অন্ধকারে ফেলে চলে গেছলেন কেন ?'

কী বলব আমি। এখনো তো আমার সেই অবস্থা। টুকু এখনো আমার শরীরে ঘন সংবদ্ধ। ইনটেলেকচুয়াল অনীশ মিত্রের উনচল্লিশ বছর বয়সের পায়ের তলার মাটি ধসে যাচ্ছে, সেই ভয়ে ওকে ছেড়ে এসেছিলাম, এ কথাটা ওকে বলি কেমন করে। বললাম, 'আমার তখন কী মনে হয়েছিল জানি না।'

টুকু চুপ করে রইল, কিছু বলল না। কিন্তু ওর মুখ আমার মুখের সামনে তেমনি আছে। হঠাৎ আমার মনে একটা কথা এল, জিজ্ঞেস করলাম, 'টুকু, আমাকে তোমার কী মনে হয় ?'

টুকু বলল, 'খুব ভাল।'

এরকম জবাবের পর আর কোন কথা বলা চলে না। ও আবার বলল, 'আপনাকে আমার খুব ভাল লাগছে। আপনি কী দারুণ গল্প বলতে পারেন ! ভূতের গল্পটা শুনে আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। আর পরের গল্পটা এমনভাবে বললেন, আমার কান্না পাচ্ছিল।'

টুকুর কথা শুনতে শুনতে আমি যেন আবার একটু সহজ বোধ

করলাম। শুধু তা-ই না, আমি দু-হাত দিয়ে ওর দুই গাল চেপে ধরে বললাম, 'সত্যি ?'

'হ্যাঁ। আর আপনি এত বড় মানুষ, আপনার একটুও অহংকার নেই।'

আমি হেসে উঠলাম, জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন করে বুঝলে ?'

টুকু আমার শার্টের কলারে হাত দিয়ে বলল, 'আমি বুঝতে পারি।'

ওর মুখ আমার আরো কাছে এগিয়ে এল। ওর নিশ্বাস আমার মুখে লাগছে। ওর নিশ্বাসে কি কোন সুগন্ধ আছে ? এ কি কপাল-কুণ্ডলার নিশ্বাসের গন্ধ—নাম ছিল যার মৃন্ময়ী ? আমি ওকে ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'এবার গাড়ি চালাই, কেমন ?'

'আচ্ছা।'

আমি স্টিয়ারিং-এর দিকে সরে গেলাম। টুকু প্রায় আমার গায়ের কাছে এসে বসল। গাড়ি স্টার্ট করে বললাম, টুকু, তুমি একটা গান কর।'

টুকু আমার মুখের দিকে দেখল, একটু পরে গুনগুন করে গান ধরল। প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যই গানের কথা বলেছিলাম। কিন্তু টুকু একটা অদ্ভুত সুরের বাঙলা গান ধরল, যাকে বোধ হয় আধুনিক গান বলে। টুকুর স্বর মিষ্টি, কাজ সুন্দর। গানের সুর আর ভাষা শুনে আমি সুখী হতে পারলাম না। প্রেমের ভাষা চটুল, দেশী বিদেশী মেশানো সুর, প্রতি কথায় কথায় কর্ড। গায়কীয় ভঙ্গিটা শ্রুতিকটু।

ও গান শেষ করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি অন্য গান জানো না ?'

'জানি, আধুনিক গানের থেকে ক্লাসিক গান আমার বেশি ভাল লাগে। খেয়াল ঠুংরি কিছু কিছু শিখেছি।'

'রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত—এঁদের গান জানো না ?'

'রবীন্দ্রসঙ্গীত কিছু জানি, ভাল পারি না। অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত জানি না।'

বললাম, 'অতুলপ্রসাদেরও অনেক ঠুংরি গান আছে। শিখলে

তোমার গলায় খুব ভাল শোনাবে।'

টুকু বলল, 'কে শেখাবে? আমার দ্বারা আর কিছুই হবে না। আমি ইংরেজি পপ সঙ্ গাইতে পারি!'

বললাম, 'তাই বুঝি? কিন্তু তোমার দ্বারা ভাল গান হতে পারে।'

'ওসব আপনি বুঝবেন না অনীশদা। আমার যে কী হবে জানি না। আমি একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব।'

'সে কী! কোথায় যাবে?'

'যেখানে খুশি। নাচ গান হৈ হুল্লোড় করে জীবনটা কাটিয়ে দেব।'

হঠাৎ কিছু বলতে পারলাম না। ওর পারিবারিক ছবিটা আবার আমার চোখে ভেসে উঠল। একটু পরে বললাম, 'তাই আবার কখনো হয় নাকি?'

টুকু কোন কথা বলল না, চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে, গতকাল রাত্রে সমুদ্র তীরের মতই। কিন্তু আমার বুকে যেন নিশ্বাস ভারি হয়ে উঠছে। অন্ধকার, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

টুকুকে নিয়ে ট্যুরিস্ট লজে এলাম। গাড়ি পার্ক করতে ও বলল, 'আসবেন একটু, মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাবেন?'

কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু গেলাম। রিসেপশন কাউন্টারে ঢোকবার আগেই মহিলা গলায় শোনা গেল, 'টুকু, আমরা এদিকে আছি।'

দেখা গেল বাঁদিকে উচু বাঁধানো চত্বরে আলোছায়ায় কারা বসে আছে। টুকু আমাকে নিয়ে সেদিকে গেল। দুটি চেয়ারে টুকুর মা

boiRboi.net

এবং চ্যাটার্জি কাকা বসে আছেন। টেবিলের উপর গেলাসে পানীয়। পাশে সোডা আর কোকাকোলার শূন্য বোতল। অ্যালকোহলের হালকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। টুকুর মা আমাকে বললেন, 'বসুন অনীশবাবু।'

বললাম, 'আমি এবার যাব, আপনারা বসুন।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'একটু বসুন না, যদি কিছু ড্রিংকের ইচ্ছে করেন, একটু গলা ভিজিয়ে যান।'

হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ, আমি কিছু ড্রিংক করব না।'

টুকুর মা টুকুর দিকে ফিরে বললেন, 'কোথায় বেড়ানো হল?'

টুকু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'ওহ্ মা জানো, কপালকুণ্ডলা কালী-ঠাকুর দেখে এলাম। সেখানে দেয়ালে রক্তমাখা খাঁড়া ঝুলছে। দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়।'

ওর মা বললেন, 'তাই নাকি, কোথায়, কণ্টাইতেই?'

'হ্যাঁ।'

টুকুর মা চ্যাটার্জির দিকে ফিরে বললেন, 'চ্যাটার্জি, তা হলে আমরাও ফেরবার দিনে দেখে যাব।'

চ্যাটার্জি বললেন, 'যা বল।'

আমি বললাম, 'আচ্ছা যাচ্ছি।'

টুকুর মা বললেন, 'টুকু আপনাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে।'

বললাম, 'ও কিছু না।'

'আবার আসবেন।'

'আসব।' দুজনকেই নমস্কার জানিয়ে, পা বাড়ালাম। টুকু আমার সঙ্গে এল।

বললাম, 'তুমি আর আসছ কেন?'

বলল, 'গাড়ি অবধি যাব।'

গাড়ির কাছাকাছি এসে, টুকু বলল, 'অনীশদা আমার ভারি লজ্জা করছে।'

'কেন?'

'তখন কী রকম ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেললাম ?'

হেসে বললাম, 'তুমি তো ছেলেমানুষই।'

টুকু ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'ইস্, আমি মোটেই ছেলেমানুষ নই।'

'তুমি বুঝি বড়ো মানুষ ?'

'আমি অনেক বড়ো হয়েছি।'

আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসলাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। রুমালটা খুলে ফেলেছে। খোলা চুল ঘাড়ের দু-পাশে ছড়ানো। ওর চোখে সেই দূরপারের ছায়া। ঠোঁটে হাসি। আমি যেন ওকে বুঝতে পারি না। কিন্তু আমার ভিতরের পরিবর্তনকে আমি আর অস্বীকার করতে পারি না। আমি যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, আমার বিকেলের বুকে একটি ভোরের ফুল ফুটেছে। জীবনের আকস্মিকতা বিচিত্র। তাকে কোন ছকেই বাঁধা যায় না। সে কথা টুকুকে বলা যায় না, হয়তো ও বুঝবেও না। তবু আমার জানতে ইচ্ছে করে, ও আমার কাছে এত সহজ হল কেমন করে। ও কি সত্যি বড় হয়েছে ?

আমি গাড়ির দরজার হাতলে হাত দিতেই প্রদীপ অলক খুকু এসে পড়ল রাস্তার দিক থেকে। অলক এসেই টুকুর একটা হাত টেনে ধরে বলল, 'আমাদের ফাঁকি দিয়ে কোথায় গেছলে তুমি ?'

টুকু একটু বিরক্ত ভাবে বলল, 'আহ্, অলকদা হাত ছাড়, আমার লাগছে।'

অলক তবু ওর হাত না ছেড়ে বলল, 'ওসব চলবে না, আমাদের ফাঁকি দিয়ে খালি বেড়ানো।'

টুকু বলল, 'আমার ইচ্ছে আমি বেড়াব।'

'নো নো নো।' বলেই টুকুর হাত ওপরে তুলে ধরে অলক রাম্বার ভঙ্গিতে একটা পাক খেল। তারপর ফিরে আবার টুকুর কোমরে হাত দিতে যেতেই, টুকু হাত ছাড়িয়ে সরে গেল। বলল, 'ও সব তুমি আমার সঙ্গে পারবে না অলকদা।'

boiboi.net

অলক গানের সুরে বলে উঠল, 'আই শ্যাল্ ফ্লাই লাইক এ স্টর্ম বার্ড।'

বলে টুকুকে ধরতে গেল। টুকু দৌড়ে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল, বলে উঠল, 'ভাল হবে না বলছি।'

ওরা তিনজনেই জোরে হেসে উঠল। আমিও হাসলাম। কিন্তু আমার হাসিটা কি তেমন পরিচ্ছন্ন উদার এবং উচ্ছ্বসিত? হায় অনীশ মিত্র, আমাদের বাস্তব বোধ থেকে জীবন আনক বেশি অপ্রাকৃত, এ বিপরীত তত্ত্ব একদা পুস্তকে পাঠ করে গভীর সত্য বলে মনে হয়েছিল। আজ নিজের জীবনে তা বড় জটিল আর রুদ্ধশ্বাস বলে মনে হচ্ছে।

খুকু জিজ্ঞেস করল, 'দিদি তোমরা কোথায় গেছলে?'

টুকু বলল, 'ওহ্, সে একটা দারুণ জায়গায়। কণ্টাইয়ের কপালকুণ্ডলার মন্দিরে। পরে গল্প বলব।'

এ মুহূর্তে সহসাই আমার মনে প্রশ্ন জাগল, জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাস পড়েছ তো?'

সকলেই চুপ করে রইল। আমি অবাক হলাম। এ বয়সের কোন বাঙালী ছেলেমেয়ের যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস পড়া নেই, আমি তা ভাবতেও পারি না।

প্রদীপ বলল, 'বঙ্কিমচন্দ্র তো বহুকাল আগের লেখক। ইস্কুলের বইয়েতে একটু আধটু পড়েছি।'

বললাম, 'তিনি ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।'

এ কথার জবাবে কেউ কোন কথা বলল না। মনে মনে রুষ্ট হলাম, কষ্টও হল। কিন্তু এদের কিছু বলতে ইচ্ছা করল না।

টুকু বলল, 'আমি এবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে ঠিক পড়ব।'

টুকু আমার কোমর ছেড়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বললাম, 'পড়া উচিত। তুমি আজ যে কপালকুণ্ডলা মূর্তি দেখে এলে, সেখানে এক সময় গভীর জঙ্গল ছিল, বালি দেখে বোঝা যায় সমুদ্রও অনেক

কাছে ছিল। মনে হয়, সে সব দেখেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের কল্পনা জেগে ওঠে।'

টুকু আবার বলল, 'আমি ঠিক পড়ব।'

অলক বলল, 'আমিও পড়ব।'

টুকু ওর দিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, 'তুমি পড়বে এইটা। কর তো দিনরাত কেবল পার্টিবাজী, বোমাবাজী, মারামারি, আর তা না হলে গাড়ি নিয়ে পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গিতে আড্ডা।

অলক বলল, 'পার্টি তো করি তোমার বাবার জন্য, তিনিই তো আমাদের লীডার।'

প্রদীপ যোগ করল, 'আর তুই বুঝি পার্ক স্ট্রীট চৌরঙ্গিতে যাস্ না টুকু? অনীশদার সামনে সাধু সাজা হচ্ছে?'

টুকু বলে উঠল, 'সে তো সকলের সঙ্গে মা-ও টানাটানি করে নিয়ে যায় বলে।'

প্রদীপ বলল, 'আর তাই তুই রোজই হোটেলে নাচতে আর খেতে যাস্।'

টুকু এবার একটু রাগের সুরে বলল, 'বেশ করি। আমি তো একটা বাজে মেয়ে। তোমরা কী? সব রকবাজ মস্তান।'

খুকু বেশ বুদ্ধিমতীর মত বলে উঠল, 'এ কি দিদি, তুমি ঝগড়া করছ?'

আমি গাড়ির দরজা খুলে বললাম, 'আচ্ছা আমি এখন চলি। তোমারা সব এবার ভেতরে যাও।'

গাড়ির ভিতরে বসলাম। সবাই এগিয়ে গেল, টুকু ছাড়া। আমি দরজাটা বন্ধ করতে পারলাম না। টুকু বলল, 'আমার খুব খারাপ লাগছে।'

হেসে বললাম, 'খারাপ লাগার কী আছে। ঝগড়া কর না। আমি চলি।'

'আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কিন্তু রাত হয়ে গেছে। এখন বাইরে আর কেউ নেই।'

boiRboi.net

টুকু আমার দিকে দেখল। নিচু স্বরে বলল, 'জানি।'

মুখ নামাল, আবার তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কাল কখন দেখা হবে?'

আমি যেন একটু চমকে উঠে বললাম, 'কাল?' একটু যেন বিব্রত ভাবেই বললাম, 'যেন রোজ দেখা হচ্ছে, তেমনিই হবে।'

টুকু স্থির চোখে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল। গাড়ির দরজায় রাখা আমার হাতের ওপর হঠাৎ আঙুল বুলিয়ে দিল। বলে উঠল, 'অনীশদা, আপনার সঙ্গে মেশবার কোন যোগ্যতা আমার নেই।'

বলতে বলতেই ওর গলা যেন ডুবে গেল। তারপর অস্ফুটে বলল, 'যাচ্ছি।'

বলেই পিছন ফিরে দ্রুত চলে গেল। আমি একটু অবাক চমকি হয়ে ওকে দেখলাম। টুকু কেন কথাটা বলল? ও আর আমার সঙ্গে মিশবে না, সেই কথা জানিয়ে গেল? অথবা, ওর নিজের জীবনের প্রসঙ্গেই দুঃখ এবং আক্ষেপ? কিছু ঠিক করতে পারলাম না। দরজা বন্ধ করে গাড়ি স্টার্ট করলাম।

রাত্রি আজ নিদ্রাহীন। জানালা খোলা। নিশীথ রাত্রে সমুদ্রের গর্জন প্রবল। অন্ধকারে শুয়ে জাগছি। জীবনে কখনও কখনও রাত্রি বিনিদ্র কেটেছে। তার কারণ ভিন্ন। কাজ অথবা পড়া অথবা কবিতা লেখা কখনও কখনও আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু চল্লিশ স্পর্শ করতে যাওয়া জীবনে এমন বিনিদ্র রাত্রি এই প্রথম। দেখছি, অনীশ মিত্র পঞ্চশরে বিদ্ধ। অথচ কোথায় এর যুক্তি, বাস্তবের বিচার? বয়স, ইনটেলেক্ট, শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি, কোথাও যার মিল নেই। এ কি আশ্চর্য অসহায়তা। আমার চোখের সামনে পরিবারের সকলের মুখগুলো ভেসে উঠল। বাবা,

মনীশ, মনীশের স্ত্রী, এমন কি আমার মৃত মায়ের মুখখানিও যেন দেখতে পাচ্ছি। সকলের অবাক জিজ্ঞাসু চোখ যেন আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। আমি বোবার মত সকলের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কোন কথা বলতে পারছি না।

সমস্ত কথাবার্তা থেকে টুকুর জীবনটা যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, বিকালের বুকে ভোরের ফুলটি যেন কীটদষ্ট। যে কীট আজকের সমাজ এবং এই সমাজজাত পরিবার। তার সঙ্গে অর্থনীতি নিশ্চয়ই যুক্ত। টুকুর বাবা ব্যবসায়ী, কিন্তু রাজনীতি করেন। কোনটা ভদ্রলোকের কাছে বড় জানি না। অলকের মত ধনীর ছেলে তার চেলা। নিশ্চয়ই পুত্র প্রদীপও তা-ই। টুকুর মাকে দেখছি, দূর সম্পর্কের দেবরের সঙ্গে বেড়াচ্ছেন। দেবর মদ্যপান করছেন। ভদ্রমহিলার গেলাসে গাঢ় রঙ কী পানীয় ছিল জানি না। প্রদীপ অলকও ড্রিংক করে। মস্তানি রকবাজী ছাড়াও কলকাতার হোটেলে বারে যায়। কী করতে যায় তাও অস্পষ্ট না এবং টুকুও নিয়মিত গিয়ে থাকে। সমস্ত চেহারাটা এমনিই দুর্ভাগা আর অন্ধকারে ঘেরা, মনে হয়, বিকালের এই অসময়ের ভোরের ফুলটি কীটদষ্ট।

হোক, কিন্তু, এই বুকে কেন সে ফোটে। এ কেন-র জবাব নেই। কোন কবি বলত, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত কবিতার সৃষ্টি হয়েছে, তা কি যুক্তির বন্ধনে বাঁধা? রাত্রি বিনিদ্র, বুক টন টন করে। কিন্তু কোন যুক্তি নেই, অভিজ্ঞতাকে বুকে বহন করে চল। চল কাল রাত পোহালে, আতুর হৃদয় নিয়ে ফিরি।

boiRboi.net

সামান্য একটু ঘুম এসেছিল। ভোরের হাওয়া গায়ে লাগতেই জেগে উঠলাম। কানে বাজছে সমুদ্রের গর্জন। জানালা দিয়ে

তাকিয়ে দেখলাম পশ্চিমের আকাশে রক্তছটা। সূর্য উঠছে। একটু তাকিয়ে থাকতে থাকতেই পূব দিগন্ত রেখায় সূর্য জেগে উঠল। আমিও তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। ঘরেই বাইরে গিয়ে ভৃত্যকে ডাকলাম। সে আসতেই চা দিতে বলে বললাম, 'ব্রেকফাস্ট তাড়াতাড়ি তৈরি কর। খেয়ে আমি কলকাতায় ফিরে যাব।'

ভৃত্য একটু অবাক হল। কিন্তু ওর প্রশ্ন করার কিছু নেই। নির্দেশ পালন করাই ওর কাজ। আমি যথারীতি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে যৎসামান্য আসন-ব্যায়াম করে স্নান সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। প্রাতরাশ এল, ঘরে বসেই খেয়ে নিলাম। একজন ভৃত্য স্যুটকেশের মধ্যে আমার সব কিছু ভরে দিল। একটি স্যুটকেশ, তা ছাড়া আমার সঙ্গে আর কিছুই নেই। সেটা গাড়িতে তুলে দিতে বললাম। মালীসহ দুজন ভৃত্য। ওদের কিছু বকশিস দিয়ে নিচে নেমে এলাম। বাগানে, ঘাসের ওপর নজর পড়ল, টুকুর আঁচলের ঘায়ে যেখানে প্রজাপতিটা ডানা ভেঙে পড়েছিল। আমার শিরদাঁড়ার কাছে যেন কেঁপে উঠল।

একজন ভৃত্য ছুটে গিয়ে গেট খুলে ধরল। আমি গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট করে ওদের সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে হেসে ঘাড় নাড়লাম। ওরা বারে বারে কপালে হাত ছোঁয়াল। রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে খানিকটা গিয়ে আমার নিজের হাতই গাড়ি থামিয়ে দিল। যেতে পারছি না। কীটদষ্ট হোক, আর না-ই হোক, ভোরের ফুলের চোখে একটা ব্যথা-বিস্মিত চনক দেখতে পাচ্ছি। তা ছাড়া, শরবিদ্ধ আমি একবার ওকে না দেখে চলে যেতে পারছি না। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে এলাম ট্যুরিস্ট লজে। গাড়ি পার্ক করে চারদিকে তাকিয়ে টুকুদের কাউকে দেখতে পেলাম না। হাত তুলে ঘড়ি দেখলাম, ন'টা বাজে। ঘরে কি কেউ আছে? হয়তো ওরা সমুদ্রের ধারে বেরিয়ে পড়েছে। তবু ট্যুরিস্ট লজের ভিতরে গেলাম। রিসেপশনে চ্যাটার্জির নাম করে দোতলায় ওদের ঘরের হদিশ জেনে নিলাম।

ওপরে উঠতেই জাজ্ মিউজিক শুনতে পেলাম। কোন ঘরে বাজছে, কে জানে। আমি টুকুদের ঘর খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে গেলাম। তারপর একটি ঘরের সামনে থম্‌কে দাঁড়ালাম। মিউজিক স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই ঘরেই বাজছে। পর্দা খানিকটা ফাঁক। সেই ফাঁকে দেখলাম টুকু আর অলক নাচছে। ওরা কেউ আমাকে দেখতে পেল না। পাবার কথাও না, কারণ ওরা পরস্পর জড়াজড়ি করে চোখ বুজে ছোট বৃত্তে নাচছে। ঘরে আর কেউ আছে কী না দেখতে পাচ্ছি না। নাচে ওরা গভীর ভাবে নিমগ্ন।

পঞ্চশর না, আর একটা তীক্ষ্ণশর যেন আমার বুকে বিদ্ধ হল। কয়েক মুহূর্ত আমি নড়তে পারলাম না। টুকুর বেশবাসও তেমন সুবিন্যস্ত না। মাথার চুলও অবিন্যস্ত। আমি সরে এসে পিছন ফিরে এগোতে যাব হঠাৎ সামনে একটি ঘর থেকে খুকু বেরিয়ে এল। আমাকে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ?'

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে হেসে বললাম, 'এমনি এসেছিলাম একটু দেখা করতে। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি।'

খুকু বলল, 'দিদি আর অলকদা বুঝি নাচছে ?'

'হ্যাঁ।' বলে আমি তাড়াতাড়ি সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। খুকু আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে বলল, 'দাঁড়ান, দিদিকে ডাকি।'

আমি সিঁড়িতে পা দিয়ে বললাম, 'না থাক, ডেকো না।'

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে রিসেপশন পেরিয়ে বাইরে চলে এলাম। দ্রুত পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। গাড়ির দরজায় হাত দিতেই পিছন থেকে চীৎকার ভেসে এল, 'অনীশদা দাঁড়ান।'

পিছনে তাকিয়ে দেখি টুকু ছুটে আসছে। ওর খালি পা, বুকের কাছে আঁচল ধরা। কপালের ওপর চুল এলানো। আমার গায়ের কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'চলে যাচ্ছেন কেন ?'

আমি হেসেই বললাম, 'যাচ্ছি, হাতে বেশি সময় নেই।'

টুকুর ভুরু একটু কুঁচকে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে ওর দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ হল। বলল, 'আপনাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে, আপনার কি শরীর খারাপ ?'

বললাম, 'না তো।'

টুকু তবু এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'হাতে সময় নেই কেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

'কলকাতা।'

টুকুর ঠোঁট যেন ঝড়ের ঝাপটায় কেঁপে গেল, উচ্চারণ করল, 'কলকাতা ?'

বললাম, 'হ্যাঁ, হঠাৎ একটা জরুরী কাজ পড়ে গিয়েছে। তোমাকে বলে যেতে এসেছিলাম।'

'তবু না বলেই চলে যাচ্ছিলেন ? খুকু না বললে আমি জানতেও পারতাম না।'

আমি হেসে বললাম, 'তাতে কী হয়েছে ? আচ্ছা এখন চলি, কেমন ?'

টুকু হাত বাড়িয়ে আমার জামার হাতা চেপে ধরল। আমার চোখের দিকে কয়েক পলক দেখল, বলল, 'সত্যি চলে যাচ্ছেন অনীশদা ?'

'হ্যাঁ, মিথ্যে বলব কেন ?'

আমি টুকুর হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। টুকু আরো জোর করে ধরল। ওর চোখ যেন ছলছল করছে। একবার মুখ নীচু করল। আবার তুলে বলল, 'তা হলে চলুন, একবার একটুখানি সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।'

'থাক না টুকু। এখন না বেরোলে আমার দেরি হয়ে যাবে।'

ওর চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছে, ব্যাকুল আবদারের সুরে বলল, 'একটুখানি।'

পরাজয় মানতে হচ্ছে। ওকে বিমুখ করতে পারছি না। আমার

চোখের সামনে ওদের নৃত্যমগ্ন ছবিটা ভাসছে। একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'চল।'

গাড়িতে উঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ দিকে যাবে?'

'যেদিকে আপনার খুশি।'

ও অন্যদিক দিয়ে উঠে আমার কাছে ঘেঁষে এসে বসল। আমি গাড়ি চালিয়ে সমুদ্র তীরের ঢালুতে নেমে উড়িষ্যা সীমান্তের দিকেই এগিয়ে গেলাম। টুকু সারাটা পথ চুপ। সমুদ্রের দিকেই চেয়ে আছে। চুল উড়ছে, আঁচল উড়ছে। প্রায় মাইল দুয়েক এসে গাড়ি থামালাম। টুকু আমার দিকে ফিরে বলল, 'হঠাৎ কেন এভাবে চলে যাচ্ছেন?'

'বললাম তো কাজ আছে।'

টুকু স্পষ্ট বলল, 'মিথ্যে কথা।'

হাসতে পারলাম না। বিমর্ষতার সঙ্গে একটু রুষ্টও হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এ কথা বলছ কেন?'

ও বলল, 'আমার মন বলছে।'

'তোমার মন!'

অষ্টাদশী টুকুর ঠোঁট বেঁকে উঠল, বলল, 'থাকতে নেই, না অনীশদা?'

তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, থাকবে না কেন?'

ও বলল, 'আপনি খুব চালাক।'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'তার মানে কী?'

টুকুও গম্ভীর। বলল, 'মানে আপনি মস্ত বড়লোক শিক্ষিত পণ্ডিত কবি—।'

আমি প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলাম, 'থাক, এসব আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না।'

টুকু প্রায় ঝেঁজে উঠে বলল, 'আমি বলব।'

অবাক হয়ে দেখলাম টুকুর মুখ রোষ রক্তিম, চোখের তারায় যেন আগুনের ঝিলিক। বলল, 'আমি জানি, আপনি কী ভেবেছেন।

boiboi.net

আপনি আমাকে—আমাদের ঘৃণা করেন। করুন গে, তাতে আমাদের কী যাবে আসবে? আমরা যা, আমরা তাই থাকবো।'

আমি একটা কথাও বলতে পারছি না। বিস্ময়ে মূক হয়ে ওর এই স্ফুরিত রাগ দেখছি, কথা শুনছি। ও আবার এক ভাবেই বলল, 'আপনাকে কি আমি কিছু লুকিয়েছি? আপনারা বড় মানুষ, ভাল মানুষ, আমরা খারাপ, নষ্ট। তবু কেন যে আপনাকে বলতে গেছলাম....।'

টুকু কথা শেষ করতে পারল না। ওর গলা যেন কান্নায় বুজে গেল। আমি ডাকলাম, 'টুকু।'

টুকু দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নাড়তে লাগল, ভাঙা গলায় বলল, 'আপনাকে তো আমি বলেছি, আমি একটা বাজে মেয়ে, একেবারে বাজে মেয়ে।'

মুহূর্তের মধ্যেই আমার চোখের সামনে থেকে একটা অন্ধকার পর্দা সরে গেল, এই ক'দিনের টুকুর একটা নতুন চেহারা ফুটে উঠল। ও যে নিজের অবস্থাটা আমাকে বারে বারে বোঝাতে চেয়েছে। চেয়েছে, তার কারণ ওর জীবনের অসহায় করুণ দিকটা দেখিয়ে আমার নিকটতর হতে চেয়েছে। ও জটিল ছিল না, সহজ, আর ওর হৃদয়ের মধ্যে একটি সরল ভালবাসা টলমল করছে। আমি আবার ডাকলাম, 'টুকু।'

টুকু সহসা ওর দিকের দরজা খুলে নেমে গেল, বলল, 'আমার কে-ই বা আছে। আপনি চলে যান অনীশদা।'

ও সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নেমে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম, ডাকলাম, 'টুকু—টুকু, শোন—'

টুকু মাথা নেড়ে ঢেউয়ের দিকে ছুটতে লাগল। আমিও ছুটলাম। 'আমার কে-ই বা আছে' কথাটা তীরের মত আমার বুকে বিঁধে তীব্র ব্যথায় ভরিয়ে দিয়েছে। ডাকলাম, 'টুকু—'

টুকু তবু ছুটল। এখন ওর জলকেও ভয় নেই। আমি তীব্র

বেগে ছুটে গিয়ে ওকে যখন ধরলাম, তখন হাঁটুর বেশি জলে ও নেমে গিয়েছে। ঢেউ ছুটে এসে আমাদের দুজনকেই ভিজিয়ে দিল। আমি ওকে কাছে টেনে নিয়ে ডাকলাম, 'টুকু।'

টুকুর জল উপছানো চোখ বোজা। মাথা নেড়ে বারে বারে বলল, 'না না না।'

আমি ওকে ধরে নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। গাড়ির কাছে এসে ওর মুখ থেকে চুল সরিয়ে দিলাম। আমার বুকের কাছে ওর মুখ। বললাম, 'টুকু, তাকাও, তাকাও।'

টুকু তাকাল, আমার দিকে না, আকাশের দিকে।

আমি বললাম, 'টুকু, আমি তোমাকে কখনও ঘৃণা করিনি।'

টুকু আস্তে আস্তে চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল। আমার বুকের কাছে এবার কথা আটকে যাচ্ছে। তবু বললাম, 'টুকু, তোমাকে আমি ঘৃণা করতে পারি না। তা হলে নিজেকেই ঘৃণা করতে হয়।'

টুকুর দৃষ্টি যেন এবার একটু স্পষ্ট হল। আমি একটু হাসবার চেষ্টা করে বললাম, 'জীবনটা খুব অদ্ভুত, তাই না টুকু?'

টুকু প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'জীবনটা কষ্টের।'

একটি আঠারো বছরের মেয়ে বলছে! আমার বুকের মধ্যে আরও তীব্র ভাবে বাজছে। বললাম, 'ঠিক। তবু জীবন খুব অদ্ভুত। তোমার সামনে এখনো অনেক দিন পড়ে আছে, তখন বুঝবে।'

টুকু বলল, 'আমার সামনের দিন? আমি জানি আমার সামনের দিনগুলো কেমন। আমি এখনই তা বুঝতে পারি।'

টুকুর কথাগুলো আবার আমার বুকে তীরের মত বাজল। তবু বললাম, 'তোমার এখনকার বোঝাটা সব সত্যি নাও হতে পারে।'

টুকু কোনো জবাব না দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকাল। আমিও সমুদ্রের দিকে তাকালাম। সেই দিকে চোখ রেখেই বললাম, 'জীবনের পথটা সোজা বরাবর চলে না। চলে না যে, তোমার সঙ্গে

আমার এখানে দেখা আর পরিচয়টাই বলে দেয়। কখন যে কোন্ বাঁকে এসে, কোথায় মোড় নিয়ে, কোন্ দিকে চলে যায়, তা কেউ বলতে পারে না। সেই জন্যই বলছিলাম, সেইসব সামনের দিনগুলোতে বুঝতে পারবে, টুকু, কেন আমাকে এভাবে চলে যেতে হচ্ছে।'

টুকু আমার দিকে তাকাল। ওর চোখ আবার ছলছলিয়ে উঠল। বললাম, 'না টুকু, তোমাকে হাসতে হবে।'

ও একবার চোখ বুজল। চুপিচুপি স্বরে বলল, 'হাসতে যে পারছি না।'

অনীশ মিত্রও কি হাসতে পারছে? ব্যথা বিদ্ধ বক্র হেসে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু টুকুর কাছে আমার কোন ছলনা নেই। আমি জানি, ওর জীবনে যত অন্ধকারই থাক, ওর সহজ মনের মধ্যে শক্তিও আছে, আর সে শক্তিকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি একটু আগেই। তাই বললাম, 'টুকু, হাসবার শক্তি তোমার মধ্যে আছে।'

টুকু আমার দিকে চোখ তুলে তাকাল। আমি বললাম, 'টুকু, তুমিও কিন্তু শক্তিমতী।'

টুকু বলল, 'বুঝি না।'

বললাম, 'হয় তো জানো না, কিন্তু জেনো। টুকু, আমাদের জীবনের শত্রু কেবল বাইরে ছড়িয়ে নেই, আমাদের ভিতরেও আছে। ছেলেবেলায় একটা কথা শুনেছিলাম, তোমাকেও বলি। হাঁস এমন একটি জীব, তাকে তুমি গভীর জলের নিচে যতোই ডুবিয়ে দাও, সে আবার ভেসে ওঠে। যে ডোবে, সে ভেসে উঠতে চায়, ভেসে ওঠে।'

কথা শেষে আমি টুকুর চোখের দিকে তাকালাম। টুকু হাসল, হাসির বিস্তৃতির সঙ্গেই চোখের কোণে টলটলিয়ে উঠছে জল। বললাম, 'চল।'

ও একবার আমার বুকের কাছে মুখ রাখল। আবার মুখ তুলে

তাকিয়ে হাসল। আমি ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। আমার জায়গায় উঠে গাড়ি স্টার্ট করে ঘুরিয়ে নিলাম। ও প্রায় আমার কোল ঘেঁষে বসে রইল। আমার কাঁধের কাছে মুখ রেখে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইল।

ট্যুরিস্ট লজের কাছে এসে থামলাম। টুকু আমার দিকে তাকাল। তারপর নিজেই দরজা খুলে নামল। আমিও নামলাম। টুকু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল, চুপিচুপি স্বরে বলল, 'হাসছি।'

ওর রক্তিম ভেজা চোখ তা বলছে না। কিন্তু জোয়ার যেন আমার চোখের কূল ভাসাতে চাইছে। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠলাম। দেখলাম টুকুর চোখ জলে ভাসছে। সেই সময়েই চোখে পড়ল, ওর মা কাকা প্রদীপ অলক খুকু, সবাই উঁচু চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে সমুদ্রের তরঙ্গ কলরোল।

গাড়ি চালালাম। বিকাল অস্তের দিকে, ভোরের ফুল জেগে রইল পিছনে। জীবন তার ঋণ শোধ করে নিতে চায়, যে কোন মূল্যে। অনেক মূল্য ভোলা যায়, অনেক মূল্য সারা জীবনে দাগ রেখে যায়। বিদায় ভোরের ফুল, এ জীবনে আর আমার প্রভাত ফিরে আসবে না।....

॥ শেষ ॥

boiboi.net